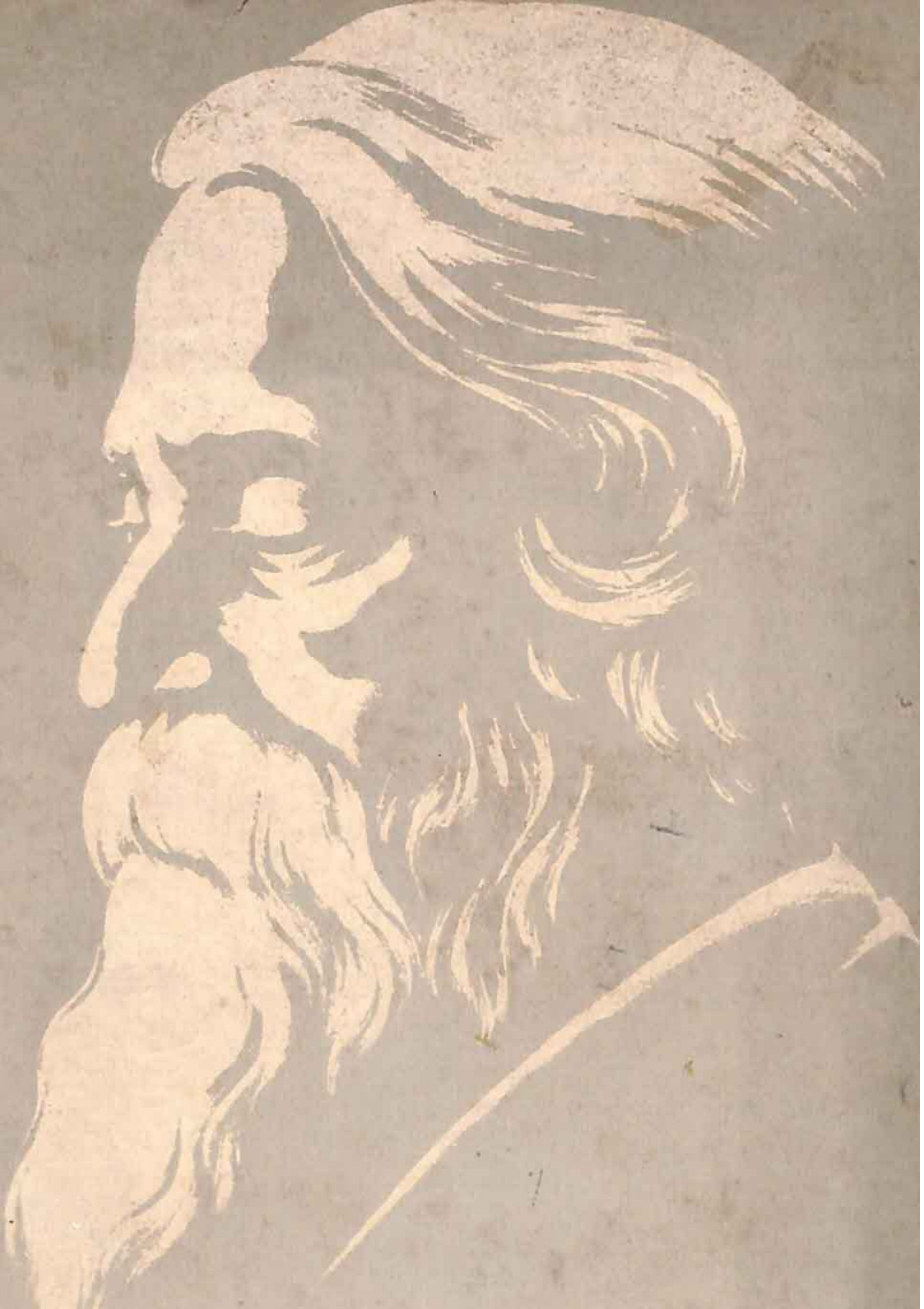


রবীন্দ্রনাথের গান

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গান

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা · বারো ·

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ—১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন

॥ তিন টাকা ॥

কৈফিয়ৎ

প্রথমেই বলে রাখি যে গানের সঙ্গে আমার আড়ি হয়ে গেছে অনেক দিন। যে এলাকায় এখন আমার বাস, সেটাকে ঠিক গানের এলাকা বলা চলে না। এ এলাকায় সুর নিশ্চয়ই আছে, মাত্রা আছে, গতি আছে, ফাঁকও আছে; এদের সঙ্গে কিন্তু গানের সুর, মাত্রা, গতি, ফাঁকের কোনো সম্বন্ধ নেই। এ এলাকায় মানুষের সমস্ত জীবনটা নিয়ে কালান্তর খেলা, শুধু কথার ও সুরের বুনুনির লীলা-ক্ষেত্র, অর্থাৎ গানের মহল এটা নয়।

এই এলাকায় আমি বহুদিন বাসা বেঁধেছি, অনেক দিন হোলো বিদায় নিয়ে এসেছি গানের মহল থেকে। তবু আজও মাঝে মাঝে কক্ষ্যচ্যুত হয়ে ছিট্‌কে এসে পড়ি গানের মহলে; সেটা নিছক আমার অবুঝ রক্তের অপরাধে, রক্তের পাগলামিতে। গানের সঙ্গে আজ আমার সাধনার যোগ নেই আছে শুধু সংস্কারের যোগ।

এককালে রবীন্দ্রনাথের গানের বায়ুমণ্ডলে আমার প্রাণ সুরের নিশ্বাস নিয়েছে। প্রকৃতির আলো বাতাসের মতোই রবীন্দ্রনাথের গান সহজ ভাবে আমার জীবনকে ঘিরে ছিলো সেদিন। গানের পর গান শুনেছি, গানের পর গান শিখেছি। শিখেছি গান রবীন্দ্রনাথের কাছে, শিখেছি দিনেন্দ্রনাথের কাছে।

এই অসামান্য গুণীদের দৌলতে বাঁধা হয়ে গেছে অন্তরের রুচির পর্দা। সুরের কাণ নিজের অজানিতে তৈরী হয়ে গেছে। সুরের ক্ষেত্রে মুড়িমিছরির দর এক, এই রসজ্ঞানহীন ঝুটো স্বাত্বিকতার বেনো জল আমার মনে কখনো প্রবেশ করতে পারেনি। তাই সুরের বিকাশের আভিজাত্য, কাণ অনায়াসে

গ্রহণ করে ; সুরের গুরুচণ্ডালী দোষ সহজেই বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তাঁর সুরের সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা মনের চেতন-অচেতন সব লোক ব্যেপে আছে যে আজো রবীন্দ্রনাথের গান শুনে নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে সুরটা প্রক্ষিপ্ত, তাঁর সুরের কাঠামোয় এ সুর-সংযোগে সম্ভব নয়, এটা রবীন্দ্রনাথের সুর নয়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর গান নিয়ে যে সুর-মেধ যজ্ঞ চলেছে তা দেখে বিস্মিত ও মর্মাহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঢঙের কথা না হয় বাদই দিলুম, সুরের যে বিকৃতি আজ নির্বিচারে করে চলেছে অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর নানা লোকে নানা দিকে, তা শুনে শঙ্কা জাগে যে এই দশ বছরেই যদি এই অবস্থা হয়, আরো দশ বছর বাদে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের কি কোন রেশ থেকে যাবে !

তাঁর গান নিয়ে ব্যবসাদারেরা ব্যবসা শুরু করেছে। এরা প্রত্যেকেই দাবী করছে যে এরা প্রত্যেকেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কিম্বা দিনেন্দ্রনাথের মুখ থেকে গান শিখেছে। প্রত্যেকেই দিনেন্দ্রনাথের রচিত স্বরলিপি এরা কিছুদিন বাদে বাদেই আবিষ্কার করছে। ব্যবসার খাতিরে মুনাফার লোভে এরা যে বেসুরো ধূলো ওড়াচ্ছে তাতে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের গান ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তা নয়, রবীন্দ্রনাথকেও এরা দিচ্ছে ধূলোর গুরুদক্ষিণা। চেলারা এমনি করে গুরুকে মেরে এসেছে চিরদিন।

মহাকবি কালিদাস বলেছেন ঃ—

যস্যাগমঃ কেবল জীবিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি—

(মালবিকাগ্নিমিত্রম্)

যাঁর জ্ঞান কেবল জীবিকার জন্য, তাঁকে জ্ঞান-পণ্য বণিক বলে।

মহাকবি কালিদাসের কালে বোধ হয় 'রস-পণ্যের বণিক' দেখা দেয় নি, তাই তিনি 'জ্ঞান-পণ্য বণিকের' নিন্দা করেই ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদের কালের 'গান-পণ্যের বণিক' দেখলে মহাকবি যে কি বলতেন তা' সহজেই অনুমেয়। 'জ্ঞান-পণ্যের' বণিক যদি নিন্দনীয় হয় 'গান-পণ্যের' বণিক সেই অনাসৃষ্টি যা' শুধু নিন্দনীয় নয় দণ্ডনীয়ও বটে।

স্রষ্টার চেয়ে টীকাকারের সংখ্যা যে বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। কেন না সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারনা, জ্ঞান ও প্রেরণা, আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও বেশীর ভাগ টীকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রুজির ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ঠিকাদারির ফাঁদ থেকে বাঁচাই যেমন খেটে-খাওয়া লোকের কাম্য, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীকাকারদের টীকাদারির ঘূর্ণি থেকে বাঁচাই হচ্ছে রস-দরিয়ার ডুবুরিদের লক্ষ্য। এ হুঁশিয়ারিটা বিশেষ করে এ যুগে খুবই দরকার কেন না শুধু খাদ্য-অখাদ্যের ব্যবসায়িরাই বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, জ্ঞানপণ্যের ও রস-পণ্যের বণিকদের কোলাহলেও বাজার সরগরম। কিছু বেচতে গেলেই খরিদ্-দারদের সামর্থের দিকে নজর দিতে হয়। রুচির বেশীর ভাগটাই হচ্ছে সামর্থ। বেশীর ভাগ লোক সামর্থের অভাবে বেশী দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে পারে না তাই ব্যাপারীকে পাঁচ মিশলি মাঝারি জিনিসই বেশী করে আনতে হয় বাজারে। রসের ক্ষেত্রের খুব উঁচুদরের রস সৃষ্টির জন্যে যে মূল্য দিতে হয়, সে মূল্য বেশীর ভাগ লোকের অন্তরের মঞ্জুষায় সঞ্চিত নেই। তাই

রস-পণ্যের যারা ব্যাপারী তারা যে খরিদ্দার বুঝে সেরা জিনিস-টাতে ভেজাল মিশিয়ে মাঝারি করে বাজারে চালাতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা যে দুঃখের এটা স্বীকার করতেই হবে। কেন না দেহের অন্নে ভেজাল যেমন সাংঘাতিক আঘাত হানে' মনের অন্নে কুশ্রীর ভেজাল, নিচু সুরের নিশ্রণ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আঘাত হানে না।

কুড়ি বছর হোতে চললো রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই তাঁর সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিতে ভেজাল মিশনোর যে আসুরিক প্রয়াস চারিদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতো অল্প দিনের মধ্যেই যখন তাঁর গানের এই মর্মান্তিক অবস্থা, আরো কিছু বছর বাদে খাদের প্রাচুর্যে ও পীড়নে তাঁর গানের সোনা হয়তো একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।

এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নয়। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত, তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তী কালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি স্বরলিপির বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্ব-ভারতীর সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক

হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্ম-প্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে তাঁদের সংগীত-বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন, কেন করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজি নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তাঁর সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়া ভাবে রবীন্দ্র-সংগীতকে ধর্ষন করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর ছায়া আশ্রিত লোকদের দ্বারা।

১। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এই গানটির স্বরলিপি ১৩৪২ সালে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'স্বরবিতান'-এর প্রথম খণ্ডে। ১৩৫৪ সালে 'স্বরবিতান'-এর যে সংস্করণ বের হয় তাতে সুরটিকে পরি-বর্তন করা হয়েছে। ১৩৫৬ সালের সংস্করণেও এই বদলানো সুরটিই বজায় রাখা হয়েছে। অশালীনতার পরাকাষ্ঠা এই যে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপির বই হিসেবে 'স্বরবিতান' এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে।

২। 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে' এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণেও এই গানের সুরটি অবিকৃত থাকে। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি অদল বদল

করে দেওয়া হয়। অবিশ্যি এই ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বলে সেটা চালানো হচ্ছে।

৩। 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানের সুরটিকে বদল করে ছাপানো হয়।

৪। 'কোথা যে উধাও হোলো' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণে সুরটির ওলট-পালট করে স্বরলিপি বের হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের উপর অসীম করুণা দেখিয়ে, ও দিনেন্দ্রনাথের উপর কৃপা করে আবার ১৩৪৩ সালের সুরে ফিরে গেছেন এই মাতব্বরেরা।

৫। 'আমারে ডাক দিল কে' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে 'নবগীতিকা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৩৭ সংলের সংস্করণেও সুরটি বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের বর্তমান অধীশ্বরদের কৃপা-দৃষ্টি লাভ করে নি। 'নবগীতিকা'-র ১৩৫৭ সালের সংস্করণে সুরটির পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬। 'আমায় ভুলতে দিতে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে 'গীতলেখা', প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৪২ সালের সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো। ১৩৬২ সালের সঃস্করণে সুরটি বদলানো হয়েছে।

৭। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ 'বৈতালিক' স্বরলিপি-গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৩৩৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো! ১৩৬২ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত এই গানটির স্বরলিপির এমন পরিবর্তন

করা হয়েছে যে তাঁর স্বরলিপি বাতিল করা হয়েছে বললেই সত্য বলা হবে।

৮। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির স্বরলিপি সংগীতবিদ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত' এর স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের সুরটির বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই গানটির স্বরলিপির পরিবর্তন দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যের দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ আজ নেই, তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থতা বিচার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে 'অন্য'টির কথা বলা হয়েছে, সেই 'অন্য'-টি কে এবং তার কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিত কালে শ্রীমতি কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটিকে প্রামাণ্য বলে ধরা যেতে পারে। নতুন স্বরলিপির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

৯। 'ওহে জীবনবল্লভ' ও 'প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী' এই দুটি গানের স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্ম-সংগীত-স্বরলিপি-তে (১৩১১-১৩১৮ সাল) প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬ সালে 'স্বরবিতান', চতুর্থ খণ্ডে এই দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়। কাঙালী-চরণ সেনের স্বরলিপির সুর তখনও বজায় থাকে। ১৩৫৮ সালের 'স্বরবিতান'-এর সংস্করণে এই দুটি গানেরই সুর বিকৃত করা হয়েছে।

১০। 'আজি বহিছে বসন্ত,' 'মোরে বারে বারে ফিরালো', 'অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী'—এই গানগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন প্রকাশ করেন 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপি'-তে। 'স্বরবিতান'-এর

১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের সংস্করণেই এই গানগুলির সুর বদল করা হয়েছে।

১১। 'স্বরবিতান,' প্রথম খণ্ডের মোট ৪টি সংস্করণ বেরিয়েছে। প্রথম সংস্করণে 'সে আমার গোপন কথা' গানটির অন্তরাতে 'প্রাণ আমার বাঁশী শোনে' ছিলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'প্রাণ যে আমার বাঁশী শোনে' করা হয়। আবার নতুন সংস্করণে (১৩৬১) 'যে' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গীতবিতানে তৃতীয় সংস্করণেও 'যে' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আর কত উদাহরণ দেবো ? এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, তাদের অপূর্বত্ব, তাদের অনন্য-সাধারণ মৌলিকত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীও তাঁদের এই সুর দলনি লীলার অনুরক্ত সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান রেকর্ড করবার অধিকার গ্রামোফোন কোম্পানী কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে সংগীত-বোর্ডের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে আদায় করেন, সে অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। বিকৃত সুর ও বিকৃত উচ্চারণ রবীন্দ্র-সংগীতের বহু রেকর্ডে বিভীষিকা জাগিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় স্বরূপ ব্যবহার না করে সংগীত বোর্ডের কর্তৃপক্ষ যদি তাঁর এই মহতী সৃষ্টির সত্য রূপটিকে অবিকৃত ও অক্ষুন্ন অবস্থায় সকলের কাছে ধরে দেওয়া তাঁদের পরম কর্তব্য বলে মনে করতেন, তাহলে গ্রামোফোন কোম্পানী অকিঞ্চিৎকর অর্থ নিয়ে যে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে তা কবে বন্ধ হয়ে যেতো।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুর-বিকৃতির জন্যে আমাদের রেডিও কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নন। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গান, তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁদের মর্জি মতো রবীন্দ্র-সংগীতের সুর একটু আধটু বদল করে গান। যেখানে তান আদপেই ছিল না সেখানে তান দিয়ে গান। এটা যে কতো বড়ো অশালীনতা তা বলে শেষ করা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার ও নিজের খেয়াল মতো রঙ (কাদা!) লেপবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে আসুরিকী লীলা সুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখেছিলেন দিলীপ রায়কে, সেটিকে মানার দিক থেকে বেপরোয়া আধুনিকদের বাধা থাকলেও, জানার দিক থেকে আশা করি বাধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তুমি কি বল্‌তে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি ত নিজের রচনাকে সে রকম ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি।.... যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম।....হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন।...কিন্তু আমার গানে ত আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

এই হোলো রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে হুড়োহুড়ি চলছে তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত।

শুধু এই নয় আরও এক ধরণের ব্যভিচার সুরু হয়ে গেছে

রাগ-রাগিণীর এলাকা-ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে নিয়ে। এ পর্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথরচিত বহু:বন্ধসংগীত। যে হেতু এই গানগুলি রাগরাগিণীর সুর-লোকের বাসিন্দে কোনো কোনো সংগীতজ্ঞ তাই ধরে নিয়েছেন যে রাগে শাস্ত্রসম্মত পুরো বিস্তার করবার অধিকার তাঁদের আছে এই গানগুলিতে। বাহার রাগে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক। এই গানটি মূলত বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ জায়গায় জায়গায় এমন দু একটি স্বর-যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করে দেখলে শুদ্ধ বাহার রাগে লাগে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো রাগ-রূপ সৃষ্টি করার কাজে লাগেন নি। তিনি সারাজীবন একটি সাধনাই করে গেছেন, আর সেটি হচ্ছে গান-সৃষ্টির সাধনা। গানের কাব্যাংশের বচনীয় ভাবটিকে অনির্বচনীয় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। এক কথায় কথা ও সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাধনা। এখন যদি কোনো ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত' গানটি মূলত বাহার রাগে রচিত বলে গানটিতে বাহার রাগের শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহলে তাঁর দুঃসাহসের প্রচুর তারিফ করেও তাঁকে স্মরণ করিতে দিতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে কখনো রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটাবার আধার হিসেবে ব্যবহার করেন নি। সুরকে তিনি ব্যবহার করেছেন শুধু গানের কথার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। তাঁর গান একলা সুরের-অ-দ্বৈত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। কথা ও সুরের দ্বৈত প্রকাশের লীলাভূমি তাঁর গান। তাই মূলত বাহার

রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাব প্রকাশের তাগিদে তিনি বাহারের বাঁধা-ধরা স্বর-নক্সার মধ্যে অন্য স্বর অসঙ্কোচে মিশিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব, তাঁর স্বকীয়ত্বের প্রকাশ, তাঁর গান-সৃষ্টির অসাধারণত্ব। যে সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথরচিত গানগুলিকে তাদের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করবেন রাগ-রাগিণীর শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোল্‌বার বাসনায়, তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষত্বটুকুকে লোপ করে এক অনন্যসাধারণ গানস্রষ্টার রচিত অসাধারণ সুরগুলিকে সাধারণ করে তুলবেন। এক কথায় এই সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ভাটপাড়ার বাসিন্দে করে তাদের জাতে তুলবেন বটে কিন্তু তাদের প্রাণে মারবেন।

পশ্চিমবংগ গভর্মেণ্টের সংগীত আকাদমির পরিচালকেরা এই উপায় অবলম্বন করেছেন রবীন্দ্রনাথের রাগসংগীত পর্যায়ের গানগুলিকে বিকৃত করবার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উদ্দেশ্য ও তাঁর সুর-রচনার উদ্দেশ্য তো বার বার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"সংগীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্টি শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"

তিনি বলছেন—"গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই। তাঁরা সংগীতকে চেতনহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে

দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁরা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন—"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীর ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকে বাহাল রাখিব না কেন?"

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ভোর সুর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বাহাল রেখেছেন। রাগ-রাগিণীর কাঠামোর শুদ্ধতার ও অশুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদপেই ব্যস্ত হন নি। যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হোলো কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেলো কি গোলো না, একমাত্র এইটেই ছিলো তাঁর দেখবার ও ভাববার বিষয়। আজ তাই রাগ-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুপষ্ট-অভিমত-বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিজান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই সব গানগুলির বিকৃতিকৃত সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করছেন, আবার এটাও লিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চল্‌বে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতিকৃত সুরও চলবে, তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা বল্‌তেই হবে যে রবীন্দ্র-সংগীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো শুধু বিশ্বভারতীর নয়, সে দায়িত্ব দেশবাসীর।

সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে গেলে সংগীত ও সংগীতের বিভিন্ন

অংশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণাগুলি আমাদের জানা একান্ত দরকার। এখন তাই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর বিশেষ ধারণা-গুলি ধরে দেবার চেষ্টা করবো।

তাঁর নিজের তৈরী গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেগুলি জানা থাকলে তাঁর গানগুলিকে থেঁতলাবার যে প্রক্রিয়া অধুনা একদল লোক চালিয়ে চলেছেন, হয়তো সেটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"**আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে।**...হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে সরিক বলে মান্‌তে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়' সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।"

দিলীপ রায়কে তিনি লিখছেন--"তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশ যে ভাবে হয়েছে আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্ব যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্রিত সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ এক হয়ে একাত্ম হয়ে মিলিত।"

এবারে তাঁর গানগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবার খুসমেজাজী স্বাধীনতা অনেকে নিয়ে থাকেন, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলছেন সেটি দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমার গানের বিকৃতি প্রতিদিন আমি এতো শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না...ললিতকলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার

রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট্ পালট্ করতে সহজে পারে বলে তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্ম বুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।"

আশা করা যাক যে তাঁর বেদনা-সিঞ্চিত এই কথাগুলি জানার পরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নিয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিকৃত করবার অপকর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত হবো।

সংগীতের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু এই তাল নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি, গানের প্রাণকে তালের গদা-ঘাতে হত্যা করবার যে বীভৎস কাণ্ড ওস্তাদী গানের আসরে প্রায়ই চোখে পড়ে সে যে সূক্ষ্মতম রসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দেবে এটা অতি সহজেই ধারণা করা যায়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তাল জিনিষটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুব বেশী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়্ড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হতে থাকে।...সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড় গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে।"

নিছক কৌশল-জানা ওস্তাদদের হাতে পড়ে গান যে সুর ও তালের কসরৎ দেখানোর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও

সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেন না রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুর-তালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেন না কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

তিনি বলছেন "রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়।...এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিল্‌তো, গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানে পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পেতো, লড়াইয়ের নয়।"

সব সৃষ্টির মতো গানও সংস্কারের শিকল পরে অচল হয়ে থাকতে পারে না। সংস্কার-বদ্ধ সৃজনীশক্তিহীন ওস্তাদেরা তাঁদের অভ্যস্ত সংস্কারের বাইরের সব কিছুকে সন্দেহের চোখে, ভয়ের চোখে, এমন কি বিদ্বেষের চেখে দেখেন। তবুও নতুন সৃষ্টি হবে, মানুষ সংস্কারের পাষাণ সরিয়ে সৃষ্টির ঝরণাকে বারে বারে মুক্তি দেবে। গানের বেলাও সেই একই কথা। সংস্কারের এই অত্যাচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরী হলেও নয়।... দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকে সে বড়ো বলে জানে প্রাণকে নয়।"

কিছু লোকের ধারণা যে আমাদের ভারতীয় সংগীত উৎ-কর্ষের এমন চূড়ায় পৌঁছে গেছে যার পরে আর কোনো শিখর তার চড়বার কিংবা দখল করবার নেই। সৃষ্টি-শক্তিতে দেউলে এই ভীরুদের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলছেন—"মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ

করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মান্‌তেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বল্‌তে হবে।"

তাঁর এই সত্যবাণীও স্মরণ রাখা দরকার যে "মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে।"

রবীন্দ্রনাথ অনেকবার আমাকে বলেছিলেন তাঁর গানগুলো প্রচারের ভার নিতে। আমি তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি নি। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকবার সে কথা মনে পড়েছে। মনে আমার ক্ষোভ ছিলো, সাধ্য ছিলো না। এমন সময় দেখা পেলুম কয়েকটি তরুণের যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। আত্মবিজ্ঞপ্তি কিম্বা ব্যবসা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার। তাঁদেরই উৎসাহে শুরু হলো 'বৈতানিক'।

প্রসাদ সেন নিলেন গান শেখাবার ভার। আর্থিক ক্ষতি, নানা বাধা উপেক্ষা করে একদল ছেলে মেয়েদের গান শিখিয়ে চল্লেন। মনটা খুসি হলো, বুঝলুম এঁদের নিষ্ঠা ফলবতী হবেই। এঁরাই রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারের অধিকারী কেন না এঁরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন ও তাঁর গান ভালবাসেন। তাঁদেরই অনুরোধে 'বৈতানিক'-অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের গানের নানা আসরে রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি। সেই ভাষণগুলির সংকলন হচ্ছে এই পুস্তিকা। অনেক কিছু বাদ থেকে গেছে, তার জন্য দায়ী ভাষণের সময়-স্বল্পতা আর আমার অক্ষমতা।

—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গান

—ঃ * ঃ—

রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ

জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আকস্মিকতার স্থান নেই। রসের ক্ষেত্রেই হোক, কি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক—সর্বত্র একটা ধারাবাহিকতা আছে, কোথাও প্রকট কোথাও-বা প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতিতেও দেখি যখন প্রয়োজন হয় নতুন জীবনের তখন জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে চলে বিপ্লব—নতুন সৃষ্টির আগে কালবৈশাখী। প্রকৃতির শুষ্কতার অন্তরে সৃষ্টির কি তোড়জোড়, কি অবিশ্রান্ত আয়োজন! ইতিহাসের মহলেও সেই একই কথা। বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়। তার পশ্চাতে থাকে বহুদিন ধরে বহু মানুষের একক ও সম্মিলিত সাধনা। দুটি স্রোতের মিশ্রণে তৈরী সমাজের চির-প্রবাহিত ধারা—একটি ভাঙনের কূল-ডোবানো বন্যা, অন্যটি সৃষ্টির পলিবাহক স্রোত।

রবীন্দ্রনাথ এমনি এক যুগে জন্মেছিলেন যখন নতুন গড়ার প্রয়োজন ছিল একান্ত। ভাঙার কাজ সুরু হয়েছিল পূর্বেই। রামমোহন দূর করেছিলেন দেশের পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

পুরোনো সমাজ তখন ধাক্কা খেয়েছে নানা দিক থেকে—নতুনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে দিকে দিকে। সেই সম্ভাবনাকে সৃষ্টির রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে। সৃষ্টির এমন দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে সার্থকতা দেখা দেয় নি। কিন্তু সব দিকে ছাপিয়ে সৃষ্টির মাধুর্য অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর গানে। তাঁর সংগীতের সাফল্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, তাঁর সৃষ্টির এমন অনেক দিক আছে যেখানে পড়ে নি সৃষ্টির পরিপূর্ণতার ছাপ; কিন্তু যতদিন বাঙালী বেঁচে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে তাঁর গান, বেঁচে থাকবেন তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। সেখানে তাঁর গলায় শাশ্বতের বরমাল্য।

অনেকেই ভাবলেন—এখনো ভাবেন—রবীন্দ্র-সংগীত বুঝি সম্পূর্ণ নতুন একটা বস্তু, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ; প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের সংগে বুঝি কোনো যোগই এর নেই। কিন্তু সংগীতের যাদের সামান্য হাতে-খড়ি হয়েছে তাঁরাই জানেন এ ধারণা কত বড় ভুল। অতীতকে বাদ দিয়ে কখনো কোনো নতুন সৃষ্টি হ'তে পারে না—যদি হয় তবে সে অনাসৃষ্টি। কিন্তু পৃথিবীতে সাহিত্য ও শিল্পের এই মহামারীর সময়ে, নিবিড় অনুভূতির অভাবে বার বার সৃষ্টির কাজ যখন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তখন একথা আমরা যেন মনে রাখি যে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গান ভুঁইফোড়, কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দেখা দেয় নি কখনো। প্রাচীন সুর,

প্রচলিত রাগ-রাগিনী এবং প্রাচীন ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির সংগে এ সংগীতের নিবিড় যোগ রয়ে গেছে।

যখন জাতীয় জীবনের স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে যায় নি, প্রাচীন ভারতে তখন দিকে দিকে এসেছে নতুনের ঢেউ। সংগীতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। এই জন্যই ভারতীয় সংগীত কখনো নিষ্প্রাণ পদার্থে পরিণত হয় নি। তখন ভারতীয় সংগীতে নানা নতুন সুরের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে নব নব সুর মিশ্রণের সাহায্যে। ভারতীয় সংগীতের চিরাচরিত কাঠামোতে এই মিশ্রণ এনেছে নতুন প্রাণ, নতুন রস। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দরবারী-সংগীত একটি বিশেষ কালে আমাদের মার্গ-সংগীতের কাঠামো ভেঙে দেয় এবং আমাদের জাতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। প্রকাশের অনন্ত ব্যাপকতা এ দেশ চিরকালই অনুভব করেছে এবং তা সার্থকতা লাভ করেছে নব নব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। সেই গৌরবময় যুগের জীবন কখনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি, কখনো অবরুদ্ধ হয় নি পরিবর্তনের স্রোত। এমনি করেই লোক-সংগীতের নতুন ধারার যোগে মার্গ-সগীতের ঠাট বদল হয়েছে, আঁটসাঁট-বাঁধন গেছে ভেঙে, কিন্তু বাঁধন ভেঙেছে বলে যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি কখনো।

ভারতীয় সংগীতে পরিবর্তনের স্রোত রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন মন দিয়ে। এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনা তিনি করেছেন। সংগীত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: সংগীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সংগে সুরের মিশ্রণই

ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু সুর নয়—সুরের সংগে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা ; বিচ্ছেদে নয়। এ ইংগিত রবীন্দ্রনাথ বারবার করে গিয়েছেন যে প্রাণহীন দেহ সুন্দর হতে পারে কিন্তু কোনো মূল্যই তার নেই।

নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "গায়কেরা সংগীতকে চেতনাহীন জড়ের ওপর স্থাপন করেন, আমি তাকে জীবন্ত করতে চাই। তাঁরা কথা বসিয়ে যান সুর বের করবার জন্যে কিন্তু আমি সুর সংযোগ করি কথার অর্থকে যথার্থভাবে প্রকাশ করবার জন্যে।"

তিনি আরো বলেছেন যে কথাই সব নয়। বাক্য যা বলতে পারে না গান তা প্রকাশ করে। সুরের রস আর কবিতার রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও এদের মিলন হ'তে পারে। রবীন্দ্র-সংগীতে এ দুটো রসই মিলেছে। না সুরের রস, না কবিতার রস কোন রসই আত্মবিজ্ঞপ্তির অহংকারে কুরুচির পরিচয় দেয়নি। কথা সুরকে অবজ্ঞা কোরে কোনঠাসা করেনি, সুরও কথাকে ছাড়িয়ে পার্থক্যের অসংগতি প্রকাশ করেনি। রসবেত্তা সুরজ্ঞের যথানির্দিষ্ট ওজনবোধ বজায় রেখে তাঁর সংগীতে নতুন সৃষ্টিই তিনি করেছেন— কিন্তু সেই সৃষ্টি রাগ-রাগিণীর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি কখনো। নৈর্বাক্তিক সুর মানবীয় রসে নিটোল হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলামীয় কাব্য-দর্শনের সংগমস্থল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যখন রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছিল, সেখানে তখন দরবারী-সংগীতের ধারা অজস্রধারে প্রবাহিত হচ্ছে। মৌলাবক্স, যদু ভট্ট প্রভৃতি বড় বড়

সংগীতজ্ঞরা ভীড় জমিয়েছেন এ বাড়ীর বৈঠকখানায়। এই পরিবেশের প্রভাবে বালকবয়সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুর বাঁধা হ'য়ে গেল, সুরের আলোর সুষমায় জীবন ফুটে উঠল। সুর-সংস্কৃতি ও রঙ-রসের সেই কৈশোর আবেষ্টনীর প্রভাব প্রথম জীবনের গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারেন নি। তখন ছিল দরবারী-সংগীতের যুগ, যে সংগীত মার্গ-সংগীত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চতুর্দিকের আবেষ্টনী থেকে তখন শুধু গ্রহণ করেই চলেছেন কিশোর ও তরুণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তায় তখনও পৌঁছন নি তিনি। তাই প্রথম যুগের গানে বিষয়-বৈচিত্র্য অপর্য্যাপ্ত থাকলেও সুরের দিক থেকে দরবারী সংগীতের বাঁধন এড়াতে পারেন নি তিনি।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, দরবারী-সংগীতে রাগ-রাগিণীর প্রাধান্য বেশী, কথার কোন মূল্য নেই সেখানে অর্থাৎ সেখানে নেই ব্যক্তির স্থান, আছে নৈর্ব্যক্তিকের প্রকাশ। তাই তিনি তাঁর গানে মিলিয়ে দিলেন ব্যক্তির সংগে নৈর্ব্যক্তিকতাকে। ব্যক্তির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অনুভূতি প্রকাশলাভ করল তাঁর গানের নৈর্ব্যক্তিক সুরে। উদাহরণ স্বরূপ 'আমার মিলন লাগি তুমি' (বাগেশ্রী-বাহার, তেওড়াতাল,) 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' (বেহাগ-চৌতাল), 'মন মোহন গহন' (আশাবরি, ঝাঁপতাল), 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ' (কানাড়া চৌতাল) প্রভৃতি গানগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। সুর ও অনুভূতির এমন অপূর্ব মিলন দেখি না অন্য কোথাও। অবশ্য সুরের দিক থেকে স্বকীয়তার প্রকাশ পায় নি এ সব গানে, প্রকাশ পেয়েছে শুধু তাঁর কথার অসামান্যতা।

গান এলো কিন্তু কবির মন ভরল না, হৃদয়ের ভার হাল্‌কা হ'ল না, অভাববোধ রয়ে গেল। দরবারী-সংগীতের আড়ষ্ট বন্ধন থেকে সুরকে মুক্তি না দিলে, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব ভালবাসার বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের ক্লাসিকল সংগীত ব্যক্তির ধার ধারে না। সে প্রকাশ করে বিশ্বরূপকে, বিশ্বজনীন সত্তাকে। আত্মগত নিঃসংগ ব্যক্তির অনুভূতির সংগে তার সম্পর্ক অতি সামান্য। একজনের সুখদুঃখ-বোধ যখন সকল মানুষের সুখ-দুঃখের মধ্যে লোপ পায়, তখন তার অনুভূতির প্রকাশ ক্লাসিকল সংগীতে, কিন্তু মানুষের মন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না এতে। সার্বজনীন সুখদুঃখ ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের জীবনে দেখা দেয় বিশেষ বিশেষ সুখদু:খের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত। এখানে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই মুহূর্তগুলি একেবারেই তার নিজস্ব। কিন্তু ক্লাসিকল সংগীতে এই বিশেষ মুহূর্তগুলির প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। যেমন ধরা যাক ভৈঁরো। এর মধ্যে সার্বজনীন সকালের প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু সব সকালই কি একই রূপ নিয়ে প্রতিদিন দেখা দেয়? ব্যক্তিবিশেষের জীবনে কি দেখা না এমন একটি বিশেষ সকাল, যে সকাল বিশ্বজনীন সকালের প্রাণের রস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র? মানুষের মন চায় এই বিশেষ মুহূর্তগুলোকেও সুরের অরূপ রেখায় বেঁধে রাখতে। সংগীত শুধু রাগ-রাগগিণীর বিশ্বরূপ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ব্যক্তির অন্তরের অনন্ত অনুভূতি, যা চির-নূতন, সুরে ও গানে তাদের প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাই অগ্রসর হলেন নতুন সৃষ্টির পথে।

যদি কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের মনেই এ প্রয়োজনের তাগিদ প্রথম দেখা দিয়েছিল, তবে তিনি ভুল করবেন। পুরাতনকে ভেঙে নতুন সৃষ্টির এমন উদাহরণ প্রতি যুগের ইতিহাসেই আছে। এমনি করেই পুরণো ঠাট ভেঙ্গে একদিন দরবারী সুরের জন্ম হয়েছিল। ধ্রুপদের আবির্ভাবও আকস্মিক ঘটে নি। একে যদি রোম্যান্টিক্ মুভমেন্ট্ বলি, তা হলে এই মুভ্মেন্ট্ সকল দেশে সকল কালেই দেখা গেছে, এখনো যাচ্ছে। জাত বাঁচিয়ে, গোত্র মিলিয়ে বিশুদ্ধতার প্রতিমা আগলে যে সব পণ্ডিতজনেরা বসে আছেন, নতুন কিছু দেখলেই তাঁরা সর্বনাশ ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। য়ুরোপে ষ্ট্রাভিন্স্কি-র সুর-সৃষ্টি নিয়ে আজ এই ধরণের কলহ উঠেছে। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে আঁটসাঁট বাঁধুনি ভাঙা যাবে না কেন? নতুনের প্রয়াস মাত্রেই অশাস্ত্রীয়, ভুল—এ কথা বলার অধিকার কে কবে কাকে দিয়েছে? রবীন্দ্রনাথ এদেশের সংগীতে এই বিপ্লব এনেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে।

ইতিহাসে এ প্রয়োজন যখনই দেখা দিয়েছে—সাহিত্যে সংগীতে কি সমাজে—তখনই যাঁরা বিপ্লবী তাঁদের বারবার ফিরে যেতে হয়েছে দেশের জনসাধারণের কুটীরদ্বারে। ড্রইং রুমে বসে এ বিপ্লব কখনো হয় নি। ড্রইংরুমের লোক-দেখানো চাতুরী ভুঁইফোড় হয়ে একদিন গজিয়ে উঠেছে, পরদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। বর্ষণের স্নিগ্ধ সুরভিত রসে যেখানে প্রাণ ভরে, শ্যামল শস্যপ্রান্তরে হাওয়া ঢেউ খেলে যায়, জেলে জাল টানে, মাঝি দাঁড় বায়, একতারা হাতে বাউল পার হয়ে যায় ধূলি-ধূসরিত পথ—সেই গ্রামে পল্লীতে ঘাটে মাঠে

বাটে জনজীবনের নিবিড় যোগে যে সুরের আবির্ভাব, বিপ্লব আসে সেখান থেকেই। বাংলার পল্লীর সংগে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড়।

স্বদেশী যুগের সেই বাংলা দেশ। পদ্মা, ইছামতীর বুকে বোট নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘাট ঘাটে ঘুরছেন। প্রাণে বন্ধন-মুক্তির ব্যকুলতা। এ বন্ধন শুধু রাজনৈতিক বন্ধন নয়, মনেরও বন্ধন। এই অচলায়তন দেশে, জীবনের যে জানালাতেই হাত দেওয়া যায় সেটিই ছিলো খুল্‌তে মানা। রাজনৈতিক শৃঙ্খলের চেয়ে জটিল শৃঙ্খল জরাগ্রস্থ দেশবাসীর মনে পাকে পাকে জড়ানো। সেই বেদনায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে কবি বাংলা দেশের নদীতে নদীতে খেয়া দিয়ে ফিরছেন। এমন সময় বিধাতার আশীর্বাদের মতো অযাচিতভাবে পেলেন গ্রাম্য বাউলের উদাস করা সুর; নদীতে নৌকো বয়ে চলেছে মাঝি—নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে, নদীর ছলছল স্রোতে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভাটিয়ালি আর সারি গান—শুনলেন তিনি সেই সুর। সেই খাঁটি বাউলের সুরে কথা বসিয়ে স্বদেশী যুগে কত গান তিনি বেঁধেছেন। পরে আবার সেই সুরের অদলবদল করে নিজস্ব ঢং ফুটিয়েছেন, কিন্তু কান পেতে শুনলেই ধরা যায় ভিতরের লোকসংগীতের নিঃশব্দ ধারাটি। উদাহরণ স্বরূপ স্বদেশী-যুগের 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'ঘরে মুখ মলিন দেখে' 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি' গানগুলি আর পরবর্তী যুগের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', 'মন যখন জাগলি না রে', 'আগুন আমার ভাই', 'এই কথাটা ধরে রাখিস' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু যা নেওয়া হ'ল, হুবহু তাই ফিরিয়ে দেওয়াকে তো আর সৃষ্টি বলে না। বন্ধন-মুক্তির সন্ধান মিললো বটে, কিন্তু বাউল গানের গ্রাম্যতা-দোষ পীড়া দিতে থাকলো কবিকে। এখানে কথার প্রাধান্যই বেশী, সুরের আভিজাত্য নেই, তার কৌলিন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাঠামো ভাঙল বটে কিন্তু সুরের গভীরতা এসে পৌঁছল না তখনও, সুরগুলি পারল না আকাশের দিকে প্রসারিত হ'তে। খাঁটি রসের সৃষ্টি সূর্যমুখী ফুলের মত—ফুটবে মাটিতে, পরিপুষ্ট হবে মাটির রসে কিন্তু তাকিয়ে থাকবে আকাশের দিকে। রবীন্দ্রনাথ এ কথা অনুভব করলেন। তাই নানা রকম পরীক্ষা চলতে লাগল বাউল-সুর নিয়ে। যা গ্রহণ করা হয় তার সকল অপূর্ণতা ঘুচিয়ে. রসরূপে উপস্থিত করা শিল্পীমাত্রেরই সাধনা—একেই বলে শিল্পের যাদু। সৃষ্টির সমস্ত প্রয়াস তাতেই ধন্য হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথও শুধু গ্রহণ করেন নি। বাউল সুরের সংগে নানা রাগ-রাগিণী মিশিয়ে তিনি সুরের ইন্দ্রজাল বুনে দিলেন, যাতে বাউল সুরের গ্রাম্যতা দূর হয়, সুরের আভিজাত্য বজায় থাকে, আবার ব্যক্তি-সত্তাও থাকে অক্ষুণ্ণ। 'আমি তারেই জানি', 'এ বেলা ডাক পড়েছে', 'কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' প্রভৃতি গানগুলি তাঁর সেই সার্থক প্রয়াসের সাক্ষ্য দেয়।

এই সময় নানা গ্রাম্য সুরের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালান। পদ্মায় থাকবার সময়ে তিনি সারি গানের সংগে পরিচিত হন এবং প্রচলিত সারির ঢঙে 'বসন্তে কি শুধু কেবল', 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' ইত্যাদি

গান রচনা করেন। পরে আবার এই মামুলি ঢঙ্ ভেঙে দিলেন, এলো তাঁর প্রাণ-ভোলানো নিজের সুর। সুরের কাঠামোটা সংকীর্ণ বুঝলে প্রায়ই তাকে তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন। এমনি ভাবে নতুন নতুন সুরের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ভাব প্রকাশ সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনীয় অদলবদল কোরে। 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' গানটি এই পর্যায়ের।

স্বদেশী যুগে আমাদের জীবনে এল প্রাণরসের জোয়ার, এলো নতুন চেতনা। বাংলা দেশের প্রাণ দুলে উঠল নতুন আলোর ঢেউয়ে। তাই এমন গানের দরকার হ'ল যা পুরাতনের গণ্ডী পেরিয়ে আমাদের মনকে ভরপুর ক'রে দেবে নতুনের আলোকে। প্রশ্ন উঠল, কোন ঠাটের উপর এই গান প্রতিষ্ঠিত হবে? যদি শুদ্ধ রাগ-রাগিণী গ্রহণ করা হয় তবে তো তাতে লাগবে না মাটির পরশ, সে গান পৌঁছুবে না সকলের হৃদয়ে। তাই যা সকল মনকে উদ্বেলিত করে তারই প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ যে গান সৃষ্টি করলেন তা হ'ল সকলের গান, ছড়িয়ে গেল তা দেশের সকল প্রাণে। এ সৃষ্টি সহজ, সরল, আর তাই এ কাজ সব চেয়ে শক্ত। সকলকে সমানভাবে দোল দেয় এ গান। যিনি সমস্ত সৃষ্টির রস নিজের হৃদয়েয় পাত্রে ভরে নিতে পেরেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ এ সৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন না। সব চেয়ে যেটি বড় সৃষ্টি, সব চেয়ে সহজ তার রূপ। শিলাই-দহে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন প্রাণ-মাতানো সহজ সুরের গান, শুনলেন গগন হরকরার সেই বিখ্যাত গান, 'আমি

কোথায় পাব তারে', অমনি সেই সুরে সৃষ্টি করলেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। আরো অনেক গা তৈরী হ'ল ঐ সুরে। বুঝলেন এই সুরেই তিনি পৌঁছতে পারবেন লোকের মনে। দরবারী বা ক্লাসিকল সুরের গান সাড়া পাবে না জনসাধারণের মনের কাছে। মাটির যে সুর, বিচিত্র তার প্রাণ, সেখানে মিলিত হয়েছে নানা ধ্বনি, নানা বর্ণ। এই মাটির কোল-ঘেঁষা সুরের মধ্য দিয়েই দেশে আনতে হবে প্লাবন। রবীন্দ্রনাথের এই সব গানই স্বদেশী যুগে বাংলা দেশের মনের দরজা খুলে দিয়েছিল, আর বিপ্লবীরা সকলের কাছ থেকে সহজ সাড়া পেয়েছিল এই গানগুলি দিয়েই। 'যদি তোর গান শুনে কেউ' গানটি 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে' গানের সুরে এ যুগেই রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের গানে যে শুধু বিশুদ্ধ দরবারী সংগীতে কিংবা অবিশুদ্ধ লোক-সংগীতের স্রোত এসে মিলে মিশে এক হয়েছে তা নয়, নানা রকম পাশ্চাত্য সুরের সমন্বয়েও তাঁর গান বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

যৌবনের প্রথমেই 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হয়েছিল। এই গীতি-নাটিকার অনেক গানেই য়ুরোপীয় সুরের বুনুনি দেখে বিস্ময় লাগে। য়ুরোপীয় সংগীত সাধনায় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ভাবে তাঁকে এ সময়ে সাহায্য করেছিলেন, বারবার রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধার সংগে তা স্মরণ করেছেন। বলেছেন, তাঁর জীবনে তাঁর জ্যোতিদাদার দানের তুলনা নেই। যে আবেষ্টনীতে তিনি মানুষ হয়েছেন সেখানে কোন দরজাই বন্ধ ছিল না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের ধারা সেখানে সমান বেগে প্রবাহিত

হ'তে পেরেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে বিদেশী সুর বাজিয়ে চলেছেন, সেই সুরে কথা বসিয়ে গান বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনি করে বাংলা গানে এলো বিদেশী সুর। সুরের যে পরীক্ষাই কেন না করতে গেছেন, দাদা তাঁকে বাধা দেন নি কোথাও। এই অচলায়তনের দেশে মহর্ষির মত পিতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত অগ্রজ পাওয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কম বড় আশীর্বাদ নয়। জীবনের সব পরীক্ষাতেই তাঁরা কবিকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন—দেখো, শোনো, পরীক্ষা করো—এই তো জীবন। রসের অন্দরমহলে, সুরের লোকে ভবের জগতে এমন অর্বাচীন কে আছে যে বলতে পারে—আর না, পেয়ে গেছি সব! অমূল্য প্রেরণা দেবার ক্ষমতা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, যার ফলে রবীন্দ্র-জীবন বিকশিত হওয়ার এমন সুযোগ পেয়েছিল। 'কালী কালী বলরে আজ', 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'সকলি ফুরলো', 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'তোমার হোলো সুরু' প্রভৃতি গানগুলি বিলিতি সুরের ছাঁদে তৈরী। এ সামান্য কৃতিত্বের কথা নয় যে কথার বাঁধুনি কোথাও সুর থেকে বেরিয়ে গেল না। পাশ্চাত্য 'চার্চ-মিউজিক' নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে এ যুগের গানগুলিতে। প্রতীচ্যের এই সুর কেমন সহজে বাংলা দেশের আপন-করা সুরে উৎরে গেল! এম্‌নি ভাবে আমরা দেখতে পাই কোন কিছুই রবীন্দ্রনাথের কাছে বিজাতীয় নেই, হরিজন নেই; সব কিছু থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এখানেই প্রকাশিত হয় স্রষ্টার আসল রূপ। তিনি কোনও নির্দিষ্ট কালের ও দেশের নন, তিনি সর্বকালের ও সর্বদেশের।

শুধু বাংলা দেশের লোক-সংগীত আর পাশ্চাত্য সংগীত থেকে সুর আহরণ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি রবীন্দ্রনাথ, ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সুর সংগ্রহ করেছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে তাঁর পথ-প্রদর্শক ছিলেন তাঁর পিতা। তিনিই রবীন্দ্রনাথের মনের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন নানা দিক দিয়ে। অমৃতসরে মহর্ষি শুনলেন একটি ভজন, অমনি সেটি তিনি প্রচলিত করলেন 'গগনের থালে রবি-চন্দ্র দীপক জ্বলে' এই ব্রহ্ম-সংগীতে। রবীন্দ্রনাথও যেখানে যে ভাল সুরটুকু শুনেছেন সেটিকে রূপ দিয়েছেন নিজের রচনায়। এ শুধু নেওয়া আর উদ্‌গার করা নয়। সুরটিকে প্রথমে নিজস্ব ক'রে পরে সেটিকে ভেঙেছেন, মিশিয়েছেন, কোথাও বা আবার নিজস্ব ঢঙে সৃষ্টি করেছেন। এমনি ক'রে মাদ্রাজী সুরে রচিত হ'ল 'নীলাঞ্জন ছায়া প্রফুল্ল কদম্ববন', 'বেদনা কী ভাষায় মর্মরে', 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী', 'বাজে করুণ সুরে', 'অন্তরের ধন প্রাণ-রঞ্জন স্বামী' প্রভৃতি গান। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চির বন্ধু চির নির্ভর', 'চির সখা ছেড়ো না মোরে' গানগুলি রচিত হয়েছে মহীশূরী সুরে। কর্ণাটি সুরে সৃষ্টি হল 'সকাতরে ওই কাঁদিছে'' বড় আশা করে ', 'আজি শুভদিনে' প্রভৃতি গান। শিখ ভজনের সুরেও গান বাঁধা হয়েছে, যেমন 'বাজে বাজে রম্য বীণা' গানটি।

হিন্দী গানকেও ভেঙে তিনি নতুন সুরের সৃষ্টি করেছেন। হিন্দী গানে যেখানে কথাগুলো শুধু সুরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই, দেখতে পাই সেখানে রবীন্দ্রনাথ কথার দারিদ্র ঘুচিয়েছেন। যেখানে কথার ছিল অনন্ত দৈন্য, সেখানে তিনি

কথার ও সুরের মালা গাঁথলেন। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর কণ্ঠে মিঞাকী মল্লার শুনে রবীন্দ্রনাথ বাঁধলেন 'কোথা যে উধাও হ'ল গানটি। 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে', 'এসো শরতের অমল মহিমা' প্রভৃতি গানও এই রকমেই রচিত হ'ল। আবার লক্ষ্ণৌ-এর ঠুংরি চালের গানের সুরে তৈরী হ'ল 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানটি।

কোথায় গেল হিন্দুস্থানী গানের উচ্চারণে বিকৃত ভাষার অসহ্যতা, সৃষ্টি হ'ল অপূর্ব গান যেখানে সুর বা কথা কারোরই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলো না। পরে এই সব চিরাচরিত ঘরোয়ানা সুর ভেঙ্গে ওলট-পালট করে নিজস্ব সুর সৃষ্টির প্রেরণা এল, তখন পেলুম গানের আসল রাজা, সুরস্রষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে। সুরের ধারা মোটামুটি অটুট রইল—যদিও নানা মিশ্রণ ও পরিবর্তন প্রবর্তিত হ'ল সুরে, যেমন পিলু, ভৈরবী প্রভৃতি মিশিয়ে রচনা করলেন 'কখন দিলে পরায়ে' গানটি।

কীর্তনও এলো। প্রচলিত যে ঢঙে গাওয়া হয়—নানা রকম আখরের মধ্যে দিয়ে ফিরে ফিরে হাঁওয়া—সেই ঢঙ অবিকল বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন। সব ক্ষেত্রেই শুদ্ধ রূপটি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি, সর্বাগ্রে কিন্তু দেখলেন ভাবের প্রকাশ তাতে অনেক সময় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই তিনি এমন সব অপূর্ব সুরের মিশ্রণ প্রচলিত করলেন যা'তে মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশিত হ'তে পারে। প্রথমদিকের আখর-সহ প্রচলিত কীর্ত্তনের সাক্ষ্য দেয় 'ওহে জীবন বল্লভ', 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু', 'কে

জানিত তুমি ডাকিবে', 'তুমি কাছে নাই বলে', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' প্রভৃতি গানগুলি। পরবর্তী কালেও কীর্তনের সুর ফিরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথের গানে কিন্তু কীর্তনের সেই সনাতন আখরের রীতি বর্জন কোরে রসের দিকে থেকে রবীন্দ্রনাথ একে শুদ্ধ কোরে নিয়েছেন। তবেই সম্ভব হয়েছে 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে', 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'রোদনভরা এ বসন্ত', 'যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী' প্রভৃতি অনবদ্য গানগুলির সৃষ্টি।

বৈষ্ণব পদাবলীর সংগে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। একদিন গিয়েছেন চন্দনগরে। সেখানে আকাশ অন্ধকার ক'রে এলো কালো মেঘ। সেদিন বৌঠাকুরাণীকে শুনিয়ে দিলেন, 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর' গানটি। সে সময়ে পদাবলী গান সভ্য সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। তখনকার ইংগ-বংগ সমাজের দৃষ্টি ছিল পাশ্চাত্য দেশের দিকে কিন্তু বিদেশী সংগীতের রসকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতি সে সমাজের ছিল না। অথচ দেশের রস-সৃষ্টি সাহিত্য, গান, সবকে অবহেলা কোরে এরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল যে এরা শিক্ষিত। সেই রকম দিনে রবীন্দ্রনাথ মোজা-বর্জিত পায়ে ড্রইংরুমে ঢুকে সে সমাজকে যেমন চম্‌কে দিয়েছিলেন একদিকে, অন্যদিকে তাদেরই সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন দেশী সংগীতকে। সে সময়ে তিনি পদাবলী সংগীতকে সার্থক করে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব রং লাগিয়ে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য রক্ষা কোরে তার অনুকরণ করা অসম্ভব

ব'লে যাঁদের ধারণা সেই সব পণ্ডিতদের দম্ভ দূর করবার জন্যেই যেন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেছিলেন। পরীক্ষার দিক থেকে তা সার্থক হয়েছে, কিন্তু গভীর রসবোধের প্রয়োজন হয়, যখন স্রষ্টা বুঝতে পারে 'শুধু নকলনবিশই রয়ে গেলুম আমি'। রবীন্দ্রনাথও তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু এই নকলনবিশ তিনি ইচ্ছে কোরেই হয়েছিলেন শুধু মাত্র পদাবলীর বিভিন্ন সম্ভাবনাটুকু বুঝে নিতে। এই সময়কার গানগুলির মধ্যে 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা', 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান', 'গগন কুসুম কুঞ্জমাঝে', 'আজ সখি মুহু মুহু', 'বাজাও রে মোহন বাঁশি', 'শুনলো শুনলো বালিকা' গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাল্যকাল থেকেই পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথ শুনতেন উপনিষদের মন্ত্র। তাঁকে নিজেও পড়তে হোতো সময়ে সময়ে ঐ সব মন্ত্র। অল্প বয়স থেকেই তাঁর জীবন বাঁধা হয়ে গিয়েছিল উপনিষদের সুরে। তাই পরবর্তীকালে তিনি বেদগানও বাদ দেন নি। অল্পবয়সেই পিতার উপাসনার মন্ত্রে তিনি সুর দেন। 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিবদৃতি', য আত্মদা বলদা' 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,' 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' প্রভৃ৷ত স্তোত্রগুলি এখনও সেই সুরে গাওয়া হ'য়ে থাকে। পরবর্তী কালে পালি স্তোত্রেও সুর সংযোজনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চণ্ডালিকার ও নটীর পূজার 'ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে', 'উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু', 'বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো', 'নমো নমো বুদ্ধায় দিবাকরায়' প্রভৃতি স্তোত্রগুলি এর নিদর্শন।

রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ

বহু শতাব্দী আগে পাঞ্জাবের উট-পালকেরা যে গান গাইতো সেটি হ'ল টপ্পা। টপ্পা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে এটি ওস্তাদী গান। আসলে এটি একেবারেই গ্রাম্য সংগীত। অযোধ্যার গোলাম নবি মারা যান উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে। তাঁর প্রিয়ার নাম ছিলো শোরী। এই নামেই তিনি প্রচলিত কোরলেন শোরীর টপ্পা। রবীন্দ্রনাথ টপ্পা গানের সুর নিয়ে চর্চা কোরেছিলেন। বাংলা দেশেও টপ্পা ছিল—নিধুবাবুর টপ্পা। রবীন্দ্রনাথ শোরীর টপ্পার ঢঙ পছন্দ কোরতেন। এ টপ্পায় বাহাত্বরী দেখিয়ে রসবর্জিত দীর্ঘ তান দেওয়ার সুযোগ নেই। এখানে প্রকাশ হোয়েছে সুরের চিকণতার। তাই রস-সংযমী রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুর টপ্পা না নিয়ে শোরীর টপ্পাই নিলেন। এই সুরে বহু গান তাঁর আছে, 'যেমন বন্ধু রহো রহো সাথ', 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে', 'হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হোল,' 'এ পরবাসে রবে কে' প্রভৃতি।

এতক্ষণ নানাসুরের পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা কোরলুম। রসের এমন কোন রেশ ছিলো না, যা তিনি গানে প্রকাশ কোরতে না চেয়েছেন। রসের প্রকৃত হদিস কোথায় তা তিনি জানতেন। তাই তাঁর হাসির গান, হাস্যরসের প্রকৃত উৎস কোথায় তার পরিচয় দেয়। তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম হাসির গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটছে', 'পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে', ও ভাই কানাই, কারে জানাই', 'কাঁটাবন-বিহারিণী সুর-কানা দেবী', 'না গান গাওয়ার দল' প্রভৃতি গান এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায়।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে—রবীন্দ্র-সংগীত বড্ড বেশী কোমল এবং নরম। সেখানে শুধু আছে চাঁদের আলো আর দখিণ হাওয়ার কথা, নেই সত্যিকারের জোর। এ কথায় সায় দেবার আগে বোঝা দরকার কাকে জোর বলে। ফুল তো বড্ড বেশী নরম এবং কোমল। অন্যদিকে হাতী একটি বিশেষ জোরালো জীব কিন্তু ফুলের জন্যে প্রাণ দেবার লোকের অভাব হবে না; অথচ হাতীর জন্যে কেউ কখনো প্রাণ দিয়েছে কিম্বা দেবে কিনা জানি না। ফুলের কি অসীম শক্তি; এই শক্তি কিন্তু তার দৈহিক জোরের প্রকাশে নয়, তার সৌন্দর্য্যের প্রকাশে। যে গান প্রাণের রসে পরিপূর্ণ এবং যে গানে সব রস প্রকাশিত কথা ও সুরের মিলিত ব্যঞ্জনায়, সেই গানেই আছে আসল জোর। প্রকাশের পরিপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর কোন্ গানে এমন সার্থকতা লাভ কোরেছে? হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন কোন অনুভূতি আছে যাকে তিনি অপরূপ রূপে প্রকাশ করেন নি তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে? বীর্য্যের গানও বাদ যায়নি তাঁর সৃষ্টি থেকে, তাঁর গান গেয়ে আমাদের দেশের ছেলেরা ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে। বন্দীর মুস্‌ড়েপড়া মন চাংগা হয়ে উঠেছে এই গানে। 'ওরে ভীরু, তোমার হাতে', 'সর্ব খর্বতারে দহে', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', 'ঐ মহামানব আসে', 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর' প্রভৃতি গানগুলি এই দিক থেকে অতুলনীয়।

তিনি শুধু কি প্রচলিত শুদ্ধ সুরের কৌলিন্য ভেঙেছেন? প্রচলিত নির্দিষ্ট সুর ভেঙে, নতুন সুরসৃষ্টির সংগে সংগে তালের

বন্ধন কাটিয়ে নতুন তালেরও প্রচলন তিনি কোরলেন। যে ছন্দ আবহমানকাল ধ'রে রয়েছে, সেই ছন্দের বন্ধনে কথা চিরকাল অচল হয়ে থাক্‌বে, একি কোনো স্রষ্টা কখনো মেনে নিতে পারেন? মহাকবির বিপ্লবী মন প্রচলিত ছন্দের বাঁধুনি ভেঙে যাত্নকরের মতো কা কাণ্ড না কোরলেন বাঙলা সাহিত্যে! শৃঙ্খলিত চরণের আড়ষ্ট বন্ধন দূর হোয়ে গেলো। বাঙলা কবিতায় জোর এলো, প্রাণ এলো ফিরে। গভীর, গম্ভীর থেকে হাল্‌কা, চটুল, কত ভাবের সাবলীল প্রকাশ সম্ভব হোয়েছে সেই কাশীরাম দাসের মধ্যাহ্ন-তন্দ্রাতুর পয়ার ছন্দের মধ্যে। মন্থরগতি মন্দাক্রান্তা গজ-গমনে যেমন চল্‌তে অভ্যস্ত—তেমনি পৃথিবীতে লঘু, চপল, তড়িৎ-গতিও তো আছে? মন্দাক্রান্তার চালে চল্‌তে গেলে এ ভাব হাঁফ ধ'রে মরে যাবে যে! যেমন কবিতার ছন্দে, তেমনি সুরের ছন্দেও এই বিপ্লবের সূচনা কোরলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন রূপকড়া : ৮ মাত্রার, তার ৩।২।৩ ছন্দে রচিত 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে', 'ঐ রে তরী দিল খুলে'; নবতাল : ৯ মাত্রার; তার ৩।২।২।২ ছন্দে রচিত 'নিবিড় ঘন আধারে'; ১১ মাত্রার একাদশীর ৩।২।২।৪ ছন্দে রচিত 'তুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' প্রভৃতি গানগুলি। প্রচলিত ৬ মাত্রার তাল ভাগ কোরলেন ৪।২ এবং ২।৪ ছন্দে যথাক্রমে 'হৃদয় আমার প্রকাশ হোলো' ও 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে' গান তু'টিতে। প্রচলিত ৫ মাত্রার ২।৩ ছন্দ উল্‌টে কোরলেন ৩।২ ছন্দ. যেমন 'যেতে যেতে একলা পথে' গানটি, আবার কোথাও দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে গান বাঁধলেন—'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়', 'তুমি তো সেই যাবেই চলে', 'দখিন হাওয়া

জাগো জাগো' 'আবার যদি ইচ্ছা কর', গানগুলি এর নিদর্শন।

এক সময়ে তিনি নিজের কবিতায় সুর দিতে প্রয়াসী হোলেন। সেগুলো তিনি লিখেছিলেন কবিতা হিসেবে, গান হিসেবে নয়। হঠাৎ খেয়াল হোলো এই সব কবিতাতেও সুর দিতে হবে। কবিতার যেমন একটা নিজস্ব রীতি আছে, তেমনি গানেরও একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। একই কবিতায় নানা রকম ভাবের প্রকাশ সম্ভব, নানা মনোভাব তা'তে আলো-ছায়া ফেলে। কবি বল্‌লেন,—আমি একটি গানের সুরের ভেতর দিয়ে সেই বৈচিত্রের প্রকাশ কোরবো। যেখানে ভাব গম্ভীর সেখানে সুরও হবে গম্ভীর, আর যেখানে ভাব চপল, সুরও হবে চপল—অর্থাৎ তিনি ভাবের অনুগামী সুর সৃষ্টি কোরতে যত্নবান হোলেন ; যেমন—'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গানটিতে। এ গানের স্তবকে স্তবকে সুরের তান, লয় ও গতি বদলে বদলে যাচ্ছে। কবিতার প্রথম অংশে গুরুগভীর বর্ষামেঘের মাদল বেজে উঠ্‌লো, তারপর এলো তড়িত-চকিত-নয়না জনপদ-বধূর চঞ্চল চরণের দ্রুত ছন্দ, বেজে গেলো অভিসারিকার শিঞ্জিনীর মতো। লীলায়িত সুরে গাওয়া হোলো তার পরের অংশ, যেখানে কেতকী-কেশরে সুরভিত কেশপাশ নিয়ে, নয়নে অঞ্জন এঁকে নব-অনুরাগিনী ভবন-শিখির সংগে কৌতুকে রত। এমনি কোরে সমস্ত বর্ষা-ঋতুর শব্দ, সুর, ছন্দ ও অনুভূতির আশ্চর্য রূপ প্রাণ পেলো এই গানে ! 'হে নিরুপমা', 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে', 'ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে', 'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা', 'নহ মাতা নহ কন্যা' প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ের।

আর একটি গানের কথা এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। গানটি কথকতার ঢঙে রচিত। এই গানে ভবিষ্যৎ সুরকারদের জন্যে নতুন সম্ভাবনার ইংগিত রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। কথকতার ঢঙ নিয়েও যে গানে কতো রকমের বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে, তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় জাগে। গানটির প্রথম চরণ হচ্ছে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। গানটিতে সুর বোল্‌তে প্রায় কিছুই নেই; কেবল এখানে ওখানে একটু আধটু কেদারা, মল্লালের রেশ মিশিয়ে দেওয়া হোয়েছে। কীর্তন ও বাউল সুরের ছোঁয়াও আছে। 'কালো' কথাটিকে ব্যবহার কোরলেন ঠিক সেই ভাবে যেভাবে আমরা কথাবার্তা বলি। সবটা মিলিয়ে যা হোলো তা' বাংলা গানের অজানা সম্ভাবনার দিকে ইংগিত কোরছে।

রবীন্দ্রনাথ সুরের মিশ্রণ কোরে যেই ভয় ভাঙিয়ে দিলেন অমনি বাংলা গানের নতুন রচয়িতারা একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এ সুরের সংগে সে সুর মিশিয়ে এক অত্যাশ্চর্য পদার্থের জন্ম দিতে আরম্ভ কোরলেন, যার চল্‌তি নামকরণ হোলো 'আধুনিক গান'। বিরস কথা, প্রাণহীন সুর, কদর্থ ভংগী অবিরত জপিয়ে জপিয়ে সর্বনাশ হোলো সংগীত-রসপিপাসার। গানের দেশ বাংলাদেশে বাস করে সকলে কি অম্লান বদনে এসব সহ্য কোরে যাচ্ছেন তা ভেবে দিশাহারা হোতে হয়। এদেশের লোক-সংগীতের মত মানুষের মনের অন্তরতম সুখ, দুঃখ, ব্যাকুলতা, বিরহ ও মিলনের এমন গান পৃথিবীর আর কোথাও শুনি নি। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং য়ুরোপের পূর্ব-পশ্চিম দেশে শুনেছি কত লোক-সংগীত—ফসল-তোলার

পর, কিংবা পাকা আঙ্গুর চুঁইয়ে মদ বানানো শেষ হোলে স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলে প্রাণের উল্লাসে নাচ্‌ছে, আর তার সংগে গাইছে ঃ চমৎকার ফসল উঠেছে, আঙুল ফলেছে, এসো নাচি ;—এই ধরণের গান। য়ুরোপের লোক-সংগীত তো এই। আর এদেশের বাউল, সারি, ভাটিয়ালি, কীর্তনের মধ্যে বিশ্বের আনন্দ-বেদনার রস প্রাণকে নিবিড় আলিংগন করে। লোক-সংগীতের এই সমৃদ্ধি ও রবীন্দ্র সংগীতের বিচিত্র চিত্তস্পর্শী আবেদন যেখানে, সে দেশেও গানের নামে আধুনিক সংগীতের এই যে ব্যাভিচার চল্‌ছে তা দেখে মাথা হেঁট হোয়ে যায়।

রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রণ আছে, কিন্তু সে কি খাপছাড়া, খেয়ালমাফিক মিশ্রণ? কোথাও কি কবি সুরের মূল প্রকৃতিকে নষ্ট হোতে দিয়েছেন? ভাঙার অধিকার তখনই আসে, যখন টুক্‌রো অংশের মধ্যেও সমগ্রের আভাষ ধরে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। সুরের সঙ্গে সুরের সংযোজনা রাখ্‌তে হবে। সবটা মিলিয়ে সমগ্রের আভাস ধরে দেওয়ার সাধ্য থাকবে—সবটা মিলিয়ে সমগ্রের ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ থাকবে—তবেই তো সেই মিশ্রণ গ্রাহ্য। ভেঙে চুরে তৈরী করবো—একথা সব স্রষ্টাই স্বীকার করেন কিন্তু প্রকৃত স্রষ্টার মনে এমন একটি অখণ্ড সমগ্রের ধারণা আছে যা'তে তাঁর সৃষ্টি একটি বিশেষ নিয়মের অনুগামী হয়, খাপছাড়া সংযোজন মাত্র নয়। মনে থাকবে সমগ্রের দ্যোতনা অথচ কোরতে হবে টুকরো—এরই মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। প্রত্যেক অংশের মধ্যে, প্রত্যেক টুক্‌রোর মধ্যে থাক্‌বে সমগ্রের ব্যঞ্জনা। আমাদের আধুনিক গানে

এই সমগ্রের অনুভূতি নেই। কায়দা মেরে বাহবা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তা'তে হয় না নতুন সৃষ্টি। একমাত্র কলাবোধের দ্বারাই এ অসাধ্য সাধন সম্ভব। স্রষ্টা পারেন, শিল্পী পারেন, কিন্তু শিল্পীর ওজনবোধের অভাব যদি ঘটে, তখন রীতি-বিরুদ্ধতা আসে। রচনা তখন সার্থক সৃষ্টি না হোয়ে কিম্ভূত-কিমাকার অনাসৃষ্টিতে পরিণত হয়। জয়জয়ন্তীর মধ্যমের জায়গায় পঞ্চম দিলে যদি ভালো শোনায় তবে না হয় সেটুকু পরিবর্তন হোলোই, তাতে সংগীত-শাস্ত্রের মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যাবে না।

রবীন্দ্র-সংগীত এতো ব্যাপক যে তার এক একটা দিক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা যেতে পারে—আর প্রচুর সময়েরও প্রয়োজন। তাই এইটুকু বোলেই শেষ কোরছি যে আমাদের জন্য তাঁর গানের যে আশীর্ব্বাদ তিনি রেখে গেছেন তা' উপযুক্ত ভাবে যাতে আমরা বহন কোরতে পারি সেই দিকে নজর দেবার সময় এসেছে।

———

রবীন্দ্র-সংগীতে সুর-বৈচিত্র্য

সৃষ্টি তপস্যা, সৃষ্টি দহন। সৃষ্টি হচ্ছে বাহুল্য বর্জন কোরে সহজের সাধনা। সৃষ্টি আবিলতা দাহন কোরে ব্যাপ্তিকে রসের গভীরতায় পরিবর্তিত করে। সৃষ্টি সাধন করে রসের শুচিতা।

প্রকৃতিতে এই লীলা চলে প্রকৃতির অচেতন নিয়মের তাড়নায়। শীতের পরে আসে বসন্ত। সেই বসন্ত ফুলের ঋতু, ফলের নয়। বসন্তের শ্যামল রূপ, ফুল রঙ্—সবই হোচ্ছে ফলের তপস্যার ইংগিত। মাটির বুক-মন্থন-করা রস, আকাশের আশীর্বাদ আলো—সবাই মিলে ফল ফলাবার কাজে লেগে গেছে, তারই ইসারা। রঙের ব্যবহার সবটাই ফলের সম্ভার হবে না। সবুজের প্রলাপ মাঠে মাঠে কিন্তু সবটাই তার লাগবে না ফল ফলাবার, ফসল ফলবার কাজে! উপরের প্রাচুর্যকে দহন কোরে অন্তরের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে অগ্নি-জ্বালা রস রূপে। সে দহনে রসের গাদ কেটে যাবে, আবিলতা দূর হবে, রস ঘন গভীরতা লাভ কোরবে—তবে ফল আস্‌বে তার পরিণতি রূপে। বৈশাখ প্রকৃতির সেই অগ্নি-জ্বালা তপস্যা, সেই রুদ্র-দহন। বাইরেটা হোলো রিক্ত, মাটির অন্তরে কিন্তু রসের অগ্নি-প্লাবন। নেমে আসে তখন আকাশ থেকে বৃষ্টি-ধারা, ধরণীর তপ্ত হিয়াকে ফসল ফলানোর কাজে তৈরী কোরতে।

মানুষেব ব্যক্তিগত জীবনে ও তার সামাজিক জীবনে এই সৃষ্টি-সাধনা চলে চেতনা ও অবচেতনা এই দুই শক্তির মিলনে।

ব্যক্তির জীবনে এ সাধনা যতটা পরিমাণে সচেতন,

সমষ্টির জীবনে এ সাধনা ততটা সচেতন নয়। সেখানে ভিন্ন-মুখী অসংখ্য চেতনার সংঘাতে ও সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি হয় তার বেশীর ভাগ অপ্রত্যাশিত। ব্যক্তির জীবনে তার বুদ্ধির বার-মহলে অনেক অতিথি এসে হাজির হয় কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই সেখান থেকে বিদায় নেয়; অনুভূতির অন্দরমহলে তারা পৌঁছতেই পারে না। যে অতিথি পৌঁছলো না সেই রস-লোকে, প্রাণের মণি-মঞ্জুষায় সে রইলো না। রস-সৃষ্টি তাকে নিয়ে হোলো না।

সৃষ্টি রস-লোকে, প্রাণের অন্দরম-মহলে; বারবাড়ির বৈঠকখানায় নয়।

প্রাণের অন্দর-মহলের এই রস-লোকে বিচার আছে; সে বিচার রসের বিচার, বাজার-দরের নয়। বর্জন আছে, কেন না রসের ক্ষেত্রে বাহুল্যের স্থান নেই, সেখানে চটুলতা নেই, আবিলতা নেই, কেন না সৃষ্টি-রস গভীর, স্বচ্ছ ও নির্মল।

যারা এসে হাজির হোলো অযাচিতভাবে, তাদের সত্যি কোরে পাওয়া হোলো না। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলো তারা যারা টিঁকে গেলো প্রাণের দহনে। সত্যি কোরে তাদেরই পাওয়া হোলো।

মানব সমাজও এই ভাবে সৃষ্টি-সাধনা করে। এক একটা সময় আসে যখন সে একেবারে ফল-হীন, একেবারে বন্ধ্যা। উপরে কিছু রঙের ছড়াছড়ি হয়তো থাকে কিন্তু সেটা প্রাণের রঙ্ নয়। রুজ্-লিপষ্টিক্-নিকোনো মুখ যেমন লাবণ্যের নিশানা দেয় না; তার অভাবেরই স্বীকৃতি, ঠিক সেই রকম।

চারদিক থেকে যা আস্‌ছে তাকে গ্রহণ কোরতে পারছে না সমাজ, সত্যিকারের গ্রহণ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাই সমাজ দেউলে সৃষ্টিতে। সমাজের শ্লথ পেশীগুলোকে সবল ও গ্রহণক্ষম কোরে তুলতে গেলে চাই সাধনা। সে সাধনা বেদনাময়, শ্লথ শরীরকে কর্মঠ করবার পরিশ্রম যেমন বেদনাময়। তার নিজের শক্তিতে আর কুলোয় না, তার কাঠামোর মধ্যে বাইরের দান আনতে হয়, তার অচলায়তনের অন্ধকার দূর কর্‌তে দরকার হয় বাইরের আলোর।

ভারতবর্ষের সমাজ একদিন বন্ধ্যা হোয়ে গিয়েছিলো। সমাজের শরীরের বনেদী-রক্ত হয়ে গিয়োছিলো পাতলা, দুর্বল। সে রক্ত ছিলো অতীতের স্বপ্নে মশ্‌গুল, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবার বীর্য তার ছিলো না, তার অন্তর্মুখীনতা সৃষ্টির অন্তর্মুখীনতা ছিলো না, ছিলো অন্তর্মুখীনতার মিথ্যে দোহাই দিয়ে জড়তার ক্লেদে জড়িয়ে থাকা। সেই অচলায়তনের প্রাচীরে বাইরের আলোর প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগলো, শ্যাওলা-পড়া স্রোতহারা সমাজ-জীবনের নদীতে এসে পৌঁছল বহুদূরের বন্যা। অর্থ-নৈতিক জীবনের কাঠামো শিথিল হোয়ে গেলো যন্ত্র-দানবের প্রবল আঘাতে। সমাজ-জীবনে সংস্কারের রিপু-কাজ সুরু হোলো। ভারতের সমাজ-জীবনের মরা গাঙে জীবনের এই জোয়ার আন্‌লেন রামমোহন।

নতুন সম্ভাবনা. নতুন আকাশ, নতুন আলো দেখা দিলো ব্যক্তির কাছে। এই সম্ভাবনার স্পষ্ট ধারণা কোরতে পারছিলো না সাধারণ লোক। বুকের ভিতর কি একটা আঁচড়াচ্ছে, বেদনা জাগাচ্ছে, প্রকাশ করবার জন্য পাঁজর ভেঙে বের হবার চেষ্টা

কোরছে অথচ পারছে না। এই লক্ষ লোকের প্রকাশ বেদনা নতুন সম্ভাবনার বেদনা, নতুন আলোর তৃষ্ণা, নতুন আকাশে ডানা মেলবার অধীরতা অলখধারায় প্রবল হ'তে প্রবলতর স্রোতে বয়ে চল্‌লো। এরা মিলে সৃষ্টি কোরলো একটি ব্যক্তিকে যে সকলের বেদনা, আশা, তৃষ্ণা ও অধীরতাকে রূপ দেবে।

এমনি কোরে যুগসন্ধিক্ষণে মহাস্রষ্টার আবির্ভাব হয়। এমনি কোরেই আবির্ভাব সম্ভব হোয়েছে সেকস্‌পীয়ারের, গ্যেটের রবীন্দ্রনাথের।

কালিদাসের পরে এত বড় কবি-প্রতিভা ভারতবর্ষে আসে নি, আর এ প্রতিভা কালিদাসকেও ছাড়িয়ে গেছে সৌন্দর্যের গভীরতায়, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও অনুভূতির অন্তর্লীনতায়।

বৈষ্ণব কবিগণ এবং ভারতচন্দ্রের পর সার্থক কাব্য-সৃষ্টি হয় নি বাংলা দেশে। ভারতচন্দ্রের পর বাংলা দেশের সাহিত্য হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো খিড়কি-পুকুরের সাহিত্য। এ পুকুরের জলে বাসন মাজা যায়, কাপড় কাচা যায় কিন্তু এতে নেই নদীস্রোতের প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথ এই খিড়কি পুকুরের সাহিত্যকে কোরলেন নদীমাতৃক সাহিত্য। দেশের ঘাটে ঘাটে ব'য়ে গেলো এর ধারা, সঞ্জীবিত হোয়ে উঠলো নির্জীব সমাজ-দেহ। তাঁর সাহিত্য শুধু নদীর মতো দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। মহাসাগরের মতো সে সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন কোরে নিলো, পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দিলো রসের পণ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও অনুপম সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সুর-সৃষ্টি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সন্ধ্যাবেলায় আমরা আলোচনা কোরবো তাঁর গানের সুর-বৈচিত্র্য নিয়ে। সেই আলোচনা প্রসংগে দেখে নেওয়া যাক্ আমাদের দেশের সুর-সৃষ্টির ধারা কি ভাবে বয়ে এসেছে।

শাস্ত্রে আছে মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটি রাগ নির্গত হয়, আর পার্বতীর মুখ থেকে নিঃসারিত হয় বৃহন্নট অথবা নটনারায়ণ। সর্বপ্রথমে এই ছয় রাগের সৃষ্টি হয়। বলা হোয়েছে এই ছ'টি রাগের প্রত্যেকটির ছ'টি কোরে ভার্য্যা ছিলো। এই কোরে ছত্রিশ রাগিণীর সংমিশ্রণে ষোলো শো উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হয় আবার এদের সংমিশ্রণে আরো অসংখ্য রাগ-রাগিণীর উদ্ভব ঘটে।

কথিত আছে যে শঙ্করবিজয় রাগ—যা মালিগৌড়া, হাম্বীর ও নটনারায়ণের মিশ্রণে সৃষ্ট—গান কোরেছিলেন শঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে পরাজিত করার পর। তাই এই রাগের নাম হোলো শঙ্করবিজয়।

নটনারায়ণ, মল্লার, হাম্বীর মধুমাধবীর মিশ্রণে মধুমিথুন বলে যে রাগ সৃষ্ট হোয়েছে, কর্ণ তার স্রষ্টা বলে কথিত।

মালবী, শ্রী, মনোহর এই তিন রাগের মিশ্রণে রাজহংস নামে যে মিশ্ররাগের সৃষ্টি হয়, ভরতমুনি তার স্রষ্টা, এই প্রবাদ আছে।

পুরাণ আর শাস্ত্রের এই সব উক্তি থেকে এইটেই প্রমাণিত হোচ্ছে যে, সৃষ্টি-প্রকরণ যে মিশ্রণে, সেটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বাকার কোরে নেওয়া হয়েছিলো আমাদের দেশে। সৃষ্টি-প্রকরণের মূল উপাদান যে বিচিত্র ও অফুরন্ত, সে তথ্য প্রাচীনকালের রাগ-স্রষ্টারা জানতেন ও স্বীকার

কোরতেন। সৃষ্টি-শক্তিতে দেউলে মনের নিঃসন্দেহ পরিচয় যাতে পাওয়া যায় সেই গোঁড়ামি, রাগ-শুদ্ধতার সেই অশুদ্ধ বিচার তখন তাঁরা আদবেই স্বীকার করেন নি। নকল পাণ্ডিত্যের বেড়া তুলে রসকে, রস-সৃষ্টিকে খর্ব করবার কাজে মরিয়া হোয়ে লেগে পড়েন নি তাঁরা।

তাই দেখি যে প্রাচীনকাল থেকেই রাগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শুদ্ধ—যে রাগের সংগে অন্য কোন রাগের মিশ্রণ নেই, সালংক—দু'টি রাগের মিশ্রণে যে রাগের সৃষ্টি, আর সংকীর্ণ—বহু রাগ সংযোগে সৃষ্ট যে রাগ।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় তাঁর 'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থে একশো-এক মিশ্র রাগের তালিকা দিয়েছেন। তাঁর মতে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান মিশ্র রাগ হ'চ্ছে এই আঠারোটি ঃ—(১) কল্যাণ-কমোদ—যার উপাদান হোচ্ছে কল্যাণ এবং নট; (২) কাফি—যার সৃষ্টিতে আশাবরী, ভৈরবী ও গুর্জরী এই তিনেরই মিশ্রণ রয়েছে; (৩) কেদারনট—কেদারী ও নটনারায়ণের মিশ্রণে তৈরী; (৪) খট্‌তোড়ী—খট্‌ এবং তোড়ীর মিশ্রণে সৃষ্টি; (৫) গুর্জরী-তোড়ী—গুর্জরী এবং তোড়ীর মিশ্রণে উদ্ভূত; (৬) জৌনপুরী-তোড়ী—তোড়ী, কুকুভা এবং সিন্ধুড়ার মিশ্রণে; (৭) দরবারী তোড়ী—তোড়ী ও কানাড়ার সংমিশ্রণে; (৮) ঠুংরী—মারু, খাম্বাবতী, ঝিঁঝিট এবং লুম মিশ্রণে; (৯) দুর্গা—মালশ্রী, লীলাবতী, গৌরী ও সারং মিশ্রণে; (১০) কৌশিকী-কানাড়া—কৌশকী ও কানাড়া মিশ্রণে; (১১) হাম্বীরনট—হাম্বার ও নট সংযোগে; (১২) হোসেনী কানাড়া—কানাড়া এবং হরাক্ষের মিশ্রণে;

(১৩) মল্লারনট—মল্লার এবং নটের মিশ্রণে; (১৪) মধুমিথুন—নটনারায়ণ, মল্লার, হাম্বীর এবং মধুমাধবীর মিশ্রণে; (১৫) রাজহংস—মালব, শ্রী ও মনোহর এই তিন রাগের মিশ্রণে; (১৬) লক্ষ্মী তোড়ী—সিন্ধু তোড়া ও ললিতার মিলনে; (১৭) মঙ্গলাষ্টক (হনুমন্ত সম্মত)—জয়শ্রী, কানাড়া, কেদারী, কল্যাণ, মঙ্গল, বিভাস, নট এবং বিহঙ্গ এই আট রাগের মিশ্রণে সৃষ্টি; (১৮) শঙ্করবিজয়—মালিগৌড়া, হাম্বীর এবং নটনারায়ণ এই তিনটি রাগের সংমিশ্রণে উদ্ভূত।

এই প্রধান আঠারোটি মিশ্র-রাগ ছাড়াও বহু মিশ্র-রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি হোয়েছে প্রত্যেক যুগে। যথা ঃ—তিলককামোদ, ধানীপুরিয়া, ইমন বেলাবলী, বসন্তবাহার, চিত্রাগৌরী, মুলতান, মিয়াকি মল্লার, ধূরিয়া মল্লার, সুরদাসী মল্লার, জজ মল্লার, মারু কল্যাণ, চাঁদিনী কেদারা, আড়ানা বাহার প্রভৃতি। সৃষ্টির ধারা কখনো রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি প্রাচীন ভারতে।

মুসলমান আমলেও বহু রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমান আমলের পূর্বে প্রচলিত ছিলো শুদ্ধ টোড়ী, কাফী টোড়ী, লক্ষী টোড়া, গুর্জরী টোড়ী, মুদ্রা টোড়ী, খট টোড়ী। মুসলমান আমলে প্রচলিত হোলো দরবারী টোড়ী। এর স্রষ্টা হোলেন স্বয়ং তানসেন। সোহা টোড়ী, সুখরাই টোড়ী, নাচাড়ী টোড়ী আর জৌনপুরী টোড়ী, সৃষ্টি কোরলেন সুলতান হোসেন আর বাহাদুরী টোড়ী রচনা কোরলেন বক্সু।

প্রাচীন গুর্জরী রাগিণী থেকে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ সৃষ্টি করলেন মাল-গুর্জরী; বাহাল গুর্জরী, মঙ্গল গুর্জরী।

প্রাচীন মতে পাঁচটি সারং ছিলো—বৃন্দাবনী, সামন্ত, পাঠহংসিকা, শুদ্ধ, মাধুমাধবী। মুসলমান আমলে সৃষ্টি হোলো মিঞার সারং। সৃষ্টি কোরলেন তানসেন।

মূলতানা সৃষ্টি কোরলেন সুলতান হোসেন, বারোয়াঁ রচনা কোরলেন সুরদাস বাবাজী আর সেফর্দা সৃষ্টি কোরলেন আমীর খসরু। প্রাচীন বেলাবলী রাগিণী থেকে সুখল্ বেলাবল সৃষ্টি কোরলেন বক্সু। ইমন্ সৃষ্টি কোরলেন খসরু। প্রচলিত পাঁচটি কানাড়া—নায়কী, কৌশকী, নাগধ্বনি, মুদ্রা আর বাগেশ্বরী বাদে হোসেনি কানাড়া রচনা কোরলেন সুলতান হোসেন। বিহাগ প্রাচীন রাগ, মুসলমান আমলে সৃষ্টি হোলো ইমন বিহাগ। ছিলো কল্যাণ, সৃষ্টি হোলো ইমন কল্যাণ। ছিলো পূরিয়া, সৃষ্টি হোলো ইমন পূরিয়া।

এই রকম কোরে অলখ ধারায় সুরের প্রবাহ বয়ে চলেছে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের দেশে।

রবীন্দ্রনাথ এই সকল সৃষ্টি-স্রোতের ধারাবাহিকতা রেখেছেন। সুরের, রাগের, রসের গুণীদের উত্তরসাধক তিনি। ভারতবর্ষের রাগ-স্রষ্টাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ। এখন যে ভাবে রাগ-রাগিণী ধরা-বাঁধা ছাঁদে বেঁধে দেওয়া হোয়েছে (Standardised) প্রাচীন ভারতের তা ছিলোনা। তখনকার সুর-স্রষ্টারা নতুন রাগ-সৃষ্টির নব নব সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরেছেন। নব নব রাগ-সৃষ্টির দিকে তাঁর প্রয়াস এবং সার্থকতা কয়েকটি গান আলোচনা কোরলেই দেখা যাবে।

'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'—গানটিতে মিলিত হোয়েছে

ভেঁরো ও ভৈরবী। কোমল 'নি' দিয়ে নেমে আসায় ভৈরবীর আভাসটি স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' গানটিতে ভৈরবীর আভাস এসেছে কোমল গান্ধারের মধ্যে দিয়ে, যদিও গানটি প্রধানতঃ রামকেলি ও ভৈরবীর সংমিশ্রণে রচিত। এই দিক থেকে 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি অপূর্ব স্বষ্টি। আশাবরী, ললিত, রামকেলি ও বিভাস— মুখ্যতঃ এই চারটি সুরের সমন্বয় হোয়েছে এখানে। মনে হয়, কত রাগ-রাগিণী যেন সুরের মিলনে ধরা দিয়েছে নিজেদের এই গানটিতে কিন্তু মিশ্রণের এমনি সূক্ষ্মতা যে, কাউকে ধরবার যো নেই। একটিকে যেই ধরে ফেলবো মনে হোচ্ছে, অমনি দেখি সেটি সরে গেছে, অন্যটি এসে হাজির। শুদ্ধ 'ধা' ও শুদ্ধ 'নি'র আশেপাশে আনাগোনা নেই, বিভাস রূপহীন অথচ 'সা রে গা রে সা' স্বরগুলি রয়েছে বিভাসের প্রতিনিধি হ'য়ে। রামকেলিও লুকিয়ে ফুটেছে স্বর-বিন্যাসে। আবার 'কুসুম ফুটে' কথাগুলির সুর ললিতকে প্রকাশ কোরেছে। সব ছাপিয়ে যে সুর আপনাকে প্রকাশ কোরেছে সে হোচ্ছে আশাবরী।

ঠাট ও মিশ্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামত ছিলো। 'সংগীতের মুক্তি'তে তিনি বলেছেন, "গানের জীবকোষ হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ সুরের মিলন। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন।" আর "এই স্বর-সংস্থান রূঢ়ী নয়, এ যৌগিক।" এম্নি করেই সকল দেশের গানে আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈারী হোয়ে ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে নিয়েই গান তৈরী হয়।" "এই ঠাটগুলির আয়-

তানের উপরেই গান রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে।··· সুরের ঠাটগুলি ইটের মতো হোলেই তাদের দিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিংবা আস্ত মহলের মতো হোলেই তাদের দিয়ে জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়।" অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড়ো ফালি, তাকেই বলে রাগিণী। আজ সেই ফালিগুলোকে ভেঙ্গে-চুরে সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছা-মতো কোঠা গড়বার চেষ্টা চলছে।" "সংগীতের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চককেই বহাল রাখিব না কেন?"

কিন্তু ভাঙা-গড়ার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। রাগ-রাগিণীর ঠাট ভেঙে ফেলে সেই উপকরণে সুরের নতুন জীব-কোষ তৈরী করবার চেষ্টা কোরলেও "সেই টুকরাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিষটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়তে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি এসে পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে স্বাধীন হোতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি লক্ষ্য থাকে তো এই বাঁধন আমাদের বাধা দিতে পারবে না" (সঙ্গীতের মুক্তি)। অন্যত্র বলেছেন, "যতো দৌরাত্মই করি না কেন, রাগরাগিনীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারিনি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তার বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই

রকমটাই চলবে। কেন না আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা-পথটায় তাকে বাঁধে না।" এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নবসৃষ্ট সুরগুলো "বড়ো আদর্শ হতে বিচ্যুত হবে না। তাদের জাত যাবে, কিন্তু জাতি যাবে না। তারা সচল হবে, তাদের সাহস বাড়বে, নানারকমের সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।"

আমাদের রাগ রাগিনীর প্রকৃতি হোলো বিশ্বরস। সেই প্রকৃতির থেকে আধুনিক সুর আমাদের কখনো একেবারে মুক্তি দিতে পারে না। আর সে মুক্তি কাম্য নয়। বিশ্ব-রসের পটভূমিকায় বিশেষ বিশেষ অনুভূতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রস ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। এই হবে আমাদের আধুনিক সুরের লক্ষ্য।

নতুন সুর-সৃষ্টির এই সূক্ষ্ম বিচার মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কয়েকটি গান আলোচনা কোরলেই এই বৈচিত্র্যের আশ্চর্য ধারা ও ব্যাপকতা বোঝা যাবে। 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', গানটিতে সারঙ-এর সঙ্গে মল্লার ও কানাড়ার মিশ্রণ হোয়েছে। সারঙ দুপুরের, মল্লার ঋতুর আর কানাড়া রাত্রির সুর। অথচ এদের কেমন সার্থক মিলন সম্ভব হোয়েছে এই গানটিতে। মীড় মূর্চ্ছনার ঠাসবুনুনি নেই এখানে, একটা স্বর থেকে অন্য স্বরে রেশ বাদ দিয়ে আকস্মিক পরিবর্তনের খেলা ধরা দিয়েছে এর সুরে। গানটির উপরে প্রধানতঃ সারঙেরই প্রাধান্য। কিন্তু তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে কানাড়া আর মল্লার। 'প্রখর

তপনতাপে' গানটিতে ভীমপলশ্রী, মূলতানী ও ভৈরবীর মিশ্রণ হোয়েছে। ভীমপলশ্রী এবং মূলতানী দুই-ই অপরাহ্ণের সুর। কিন্তু সঞ্চারি পদের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে ভৈরবীর কোমল নি, দা, জ্ঞা, ঋা, দেওয়া হোয়েছে। অপরাহ্ণের গানে ভৈরবীর ছোঁওয়া বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে। কিন্তু এই ভৈরবীর ছোঁওয়াই গানটিকে অবর্ণনীয় মাধুর্য দিয়েছে। ভীমপলশ্রীর সঙ্গে মূলতানীর মিশ্রণে অনেক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, যেমন 'বুঝি বেলা বয়ে যায়,' 'আকাশে আজ কোন্ চরণের', 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে,' 'যদি হায়, জীবন পূরণ নাই হল' প্রভৃতি। 'পথে যেতে ডেকেছিল' গানটিতে পিলু ও বারোয়া এই দুটি অপরাহ্ণের সুর মিলিত হোয়েছে, কিন্তু সুরের চেহারায় এসেছে গাম্ভীর্য। বিলম্বিত লয়ের গাম্ভীর্য দিয়ে পিলুর চটুলতা আর বারোয়ার রঙের ঝিকিমিকি খেলা দূর করা হয়েছে।

সন্ধ্যের ও রাতের সুর-মিশ্রণেও বহু গান সৃষ্টি কোরেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর' গানটি শুদ্ধ ইমনে রচিত। বর্ষার গানে ইমন ব্যবহার কোরে সমস্ত প্রচলিত রেওয়াজ (convention) ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ এই প্রয়োগের সার্থকতা গানটির ভাব থেকে সহজেই অনুভব করা যায়। বর্ষার গানে বিষাদ-ব্যঞ্জক সুর দেওয়াই প্রচলিত। ধীর মন্থরতা, বর্ষণের অপেক্ষা, কালো কাজল মেঘের বিষাদ—এই হোলো বর্ষার প্রচলিত সুরের রূপ, যা মল্লারে রূপায়িত হয়। কিন্তু বর্ষার ধারার উদ্দাম উল্লাস, বুক-ছাপানো তরঙ্গ দলের নৃত্য, শালের বনে ঝড়ের পাগলামি—এ সব ফোটে না মল্লারে। তাই ইমন

ব্যবহার ক'রে দ্রুত তেওড়া তালের ছন্দে বর্ষার এই বিশেষ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

আগে বেহাগে কোমল 'নি' ব্যবহার করা হোতো আরোহণ ও অবরোহণে, হালে হোচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব বেহাগ সুরের গানেই কোমল 'নি' ব্যবহার কোরেছেন। যেমন প্রথম বয়সের রচনা 'ওগো শোনো কে বাজায়' গানটিতে। এ ছাড়া 'মেঘ বলছে যাব যাব,' (শুদ্ধ বেহাগ) 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' (বেহাগ খাম্বাজ) প্রভৃতি গানেও কোমল 'নি' ব্যবহার দেখা যায়।

সার্থক মিশ্রণে সুরের যে অপূর্বতা প্রকাশ পায়, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানেই দেখা যায়। তিলক কামোদ ও দেশ রাত্রির সুর। তার সঙ্গে বর্ষার মল্লার সুরের মিশ্রণ পূর্বে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এই মিশ্রণ প্রচলন কোরলেন। তাঁর 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো, গানটি এই সুরে রচিত।

'কোথা যে উধাও হল' গানটি সাহানা ও কানাড়ার মিশ্রণে রচিত। হিন্দুস্থানী সুর ভাঙা হোলেও গানটি লয়ের ও স্বরবিন্যাসের পরিবর্তনে নতুন সৃষ্টি হোয়ে উঠেছে। প্রথম অংশ সাহানা কানাড়া, তার সঙ্গে আড়ানার স্বরবিন্যাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নামিয়ে আনছেন। হিন্দী গানে এরকম আড়ানার স্বরবিন্যাস নেই। অন্তরাতে বেশ কিছু মল্লারের ছোঁওয়াও আছে। অন্তরা থেকে নেমে আসবার সময় আড়ানার স্বরবিন্যাস দিয়ে নেমে আসছে। আবার শেষ অংশে দেশ-মল্লারের আভাষ আছে।

এই গানটি সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য কোরতে হবে।

রবীন্দ্র বাঁধা ছন্দকে ভেঙে স্বাভাবিক কথা বলার ছন্দে গান রচনা কোরেছেন। অবিশ্যি কথার ছন্দে গান রচনা করা খুবই শক্ত। এর জন্যে চাই গভীর রসবোধ, কারণ কোথায় সুরের টান ছোট-বড়ো হবে, লয় দ্রুত কিম্বা ঢিমে হবে, গানের কথাগুলি একটি আর একটির গায়ে হেলে চল্‌বে কিম্বা ছাড়াছাড়িভাবে চল্‌বে—এসব লক্ষ্য কোরতে হবে গীতিকারকে। নইলে সুর ও কথা অসংলগ্নভাবে চল্‌বে। প্রচলিত তালের বাধাহীন অনিয়ন্ত্রিত ছন্দের অনেক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা কোরেছেন যেমন 'সখী,' আঁধারে একেলা ঘরে,' অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে,' 'বন্ধু, রহো রহো সাথে,' 'কার বাঁশি নিশি ভোরে,' 'এসো শরতের অমল মহিমা,' ইত্যাদি। 'কোথা যে উধাও হল' গানটি এই পর্যায়ের।

গান্ধার লাগিয়ে মেঘমল্লার আগে গাওয়া হোতো, হালে হয় না। রবীন্দ্রনাথ গান্ধার লাগিয়ে মেঘমল্লারে রচনা কোরলেন 'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল' গানটি।

* * *

সৃষ্টি বহুরূপী, সৃষ্টি বর্ণ-সংকর। এক-রঙা সৃষ্টি নেই।

মিশ্রণ গ্রাহ্য তো বটেই, আর এই মিশ্রণের লীলায় হোলো সৃষ্টিকর্তার, রূপস্রষ্টার, কলাবিদের পরিচয়। শুধু এইটে মনে রাখতে হ'বে যে এক সুরের সঙ্গে অন্য সুরের মিশ্রণ খাপ-ছাড়া না হয়। তান যেমন সুরের মূল প্রকৃতির অবলম্বন, মিশ্রণও তেমনি সুরের মূল প্রকৃতির অবলম্বনে। মিশ্রণের স্বাধীনতা সুরের এই মূল প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সজাগ থাকতে হ'বে স্রষ্টাকে একটি বিষয় সম্বন্ধে—রীতিবিরুদ্ধ হোচ্ছে

কিনা তার সৃষ্টি। রীতিবিরুদ্ধতা হোচ্ছে রসের ওজনবোধ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রভাব, সৃষ্ট বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বেখাপ্পা যোগাযোগ, রূপের অবয়বের প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ। এটা গানেও ঘটে, যেমন আধুনিক গানে ঘটছে। রূপকারের ভাঙবার অধিকার আমি স্বীকার করি। এ অধিকার আমি কিছুতেই ছাড়তে রাজী নই। তবু ভেঙে-চুরে জুড়বার সময় মনে রাখতে হ'বে যে, এই টুকরোগুলোর মধ্যে সমগ্রের একটা ব্যঞ্জনা আছে, যেমন হাতের অংশের মধ্যে সমগ্র হাতের ব্যঞ্জনা আছে—লেজের নেই; চোখের টুকরোর মধ্যে পূর্ণ চোখের মাধুরিমার আভাস আছে—গজদন্তের নেই। তাই জুড়তে গেলে একটা সমগ্র আদর্শের ছবি মনে রাখতেই হবে নইলে রসসৃষ্টি হয়ে উঠবে বীভৎস, যা চোখে পড়ে আধুনিক গানের কথায় সুরে, আধুনিক কবিতার কথায় ও আধুনিকদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে টুকরোর মধ্যে সমগ্রের ব্যঞ্জনা আছে মেনেই না হয় নেওয়া গেলো কিন্তু সে সমগ্রের ধারণা যে একই হবে তার মানে কি? এই টুকরোগুলোর যে অনন্ত সংযোগ অন্তহীন নব নব রূপ সম্ভব নয় তা কে বোল্‌লে?

নিশ্চয়ই সম্ভব, আর সেটা সম্ভব বোলেই রূপসৃষ্টির, রস-সৃষ্টির, সুরসৃষ্টির নিরাম আজও নেই, কখনও হবে না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার কোরে বলা যাক্। ধরে নেওয়া যাক্ যে দুঃখের অনুভূতি হোয়েছে রূপকারের তিনি সেই দুঃখকেই মূর্তি দিচ্ছেন রূপে, সুরে। সেই দুঃখের রস অসীম রূপ গ্রহণ কোরতে পারে। সেই দুঃখের রূপায়নে অফুরন্ত মালমশলা ও

উপাদান লাগবে, এক রূপকারের সৃষ্টিতে এই মালমশলা ও উপাদান হবে এক রকমের, অন্য একজনের হবে অন্য রকম কিন্তু দু'জনেই রসলোকে উপলব্ধি কোরেছেন। সেই রূপটি সৃষ্টি কোরতে যত কিছু মালমশলা লাগুক না কেন আর যতই বিচিত্র হোক না কেন, সে সব মাল-মশলা দুঃখের রূপটি সৃষ্টি করবার জন্যেই লাগাবেন ঐ রূপকার দু'জন। দুঃখের রূপ্টি ফোটাবার জন্যে কেউ হাসিকেও উপাদান ব্যবহার কোরতে পারেন, কিন্তু হাসি সেখানে একান্তভাবে দুঃখেরই উপাদান, দুঃখেরই রূপ, আনন্দের রসসৃষ্টির উপাদান নয়। একেই আমি বোলছি সমগ্র রূপের ধারণা। মালমশলাগুলোকে সেই সমগ্র ধারণার অনুযায়ী নির্বাচন করা, সেগুলো সেই অখণ্ড রূপ ধারণাকে পুষ্ট কোরছে কিংবা খণ্ডন কোরছে, সেই দেখাই রূপকারের কার্য। প্রত্যেকটি উপাদান যদি তার নিজস্বতা প্রমাণ কোরতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে যেটা সৃষ্টির উপপাদ্য সেটা নষ্ট হোয়ে যাবে। পরস্পরবিরুদ্ধ স্ব স্ব প্রধান উপাদান মিলিয়েও বিরুদ্ধতরে রূপ ফোটানো যায়, রূপকার পারেন এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার রূপ দিতে, কিন্তু এক্ষেত্রে উপাদানগুলি সব বিরুদ্ধতার সমগ্ররূপে মালমশলা মাত্র।

সুরের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। রৌদ্র্ ঝলমল শরতের মন-কেমন করা একটি দুপুরের বেদনা-মাখানো সুর যে সুরকার সৃষ্টি কোরবেন, সে সুরকার যে শুধু মূলতানী আর বারোয়াঁর ঠাটগুলি ভেঙে-চুরে সেই সুর সৃষ্টি কোরবেন, তাই নয়, তিনি নানা রাগ-রাগিণীর ঠাট ভেঙ্গে ও জুড়তে

পারেন, কিন্তু সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলোর প্রকৃতি হবে এক, তারা বেদনার প্রতীক হবে, বিষাদের ছোয়া থাকবে তাতে, লঘু হোলেও চপল হবে না। গড়ের বাদ্যি বা জগঝম্পের প্রবল আস্ফালন তাতে থাকবে না।

কেউ বোল্‌তে পারেন, যে, তাই বা কেন? খুব খানিকটা উত্তেজনা আস্ফালন আমার কাছে বিষাদের সুরের অন্তর্ভূক্ত বোলে মনে হ'তে পারে। তার উত্তরে বোলতেই হবে যে যদি তাই হয়, তবে সুরকার নিরুপায়, এ পৃথিবীর সাধারণ লোকের তা হয় না। আর বোলতে হবে, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'।

তাই নব সুরসৃষ্টির সময়, সুরের মিশ্রণের সময় মিশ্রণের যে অলজ্ঘনীয় নিয়ম মনে রাখতে হবে সেটি হোচ্ছে এই যে যেটি প্রকাশ কোরতে চাচ্ছি তার সমগ্র রূপের রসমূলক অখণ্ড ধারণা হওয়া চাই। সেটি না হোলে সব ব্যর্থ সৃষ্টির মত সুরসৃষ্টি অনাসৃষ্টি হবে। তার মধ্যে সুরের অসংলগ্ন জোড়াতালি নজরে পড়বে।

আরো দুটি নিয়ম মনে রাখতে হবে। সুরের অবিচ্ছেদ প্রকাশের দিকে সজাগ থাকবে স্রষ্টার মন। এক সুর থেকে অন্য সুরে যাবার সময় দুটি সুরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ গুলি অনুভূত হয় সেগুলোকে সঙ্গীতশাস্ত্রগণ শ্রুতি আখ্যা দিয়েছেন। সুরের অবিচ্ছেদ সংলগ্ন ও শোভন প্রকাশের পক্ষে এই অনুভূতি অতি প্রয়োজনীয়। দুটি সুরের মধ্যের সুরের সূক্ষ্মাংশগুলি কোনো লক্ষণ দিয়ে ধরা যায় না, এগুলি সম্পূর্ণ ও একান্ত অনুভূতির বস্তু। শাস্ত্রকার এর

চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বোলেছেন ; জলের মধ্যে দিয়ে মাছ যায়, জল দেখে যেমন তার কোন চিহ্ন ধরা যায় না, আকাশে পাখী উড়ে যায়, অথচ তার ওড়ার পথ যেমন পরিলক্ষিত হয় না, শ্রুতি ঠিক তেমনি। এ শুধু অনুভূতির বস্তু কিন্তু এই অনুভূতি, এক সুর থেকে অন্য সুরে যাওয়ার মধ্যের সারাংশের সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুর রচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। তাই সুর স্রষ্টার অনুভূতি অতি তীক্ষ্ম হওয়া চাই। এই শ্রুতি-অনুভূতির সঙ্গেই সংলগ্ন রয়েছে মূর্ছনার জ্ঞান অর্থাৎ এক সুর হতে অন্য সুরে যাবার জন্যে সুরের সেতু-রচনার জ্ঞান। তাই বলা যেতে পারে যে সার্থক সুর-রচনার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় হচ্ছে, যা প্রকাশ কোরতে চাচ্ছি তার সমগ্র রূপের রস-উপলব্ধি, সেই সমগ্র রূপের উপলব্ধির যোগ্য সুর-রূপ সৃষ্টি, সেই সুরের ধারার অবিচ্ছেদ গতির জন্যে শ্রুতির অনুভূতি আর মূর্চ্ছনার জ্ঞান। এইগুলিকেই আমি সুর সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম ব'লে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের-সুর-সৃষ্টিতে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। কখনো, তা রসজ্ঞ মাত্রেই অনুভব কোরবেন। তাই তার প্রতিটি সৃষ্টিই অনবদ্য, রসের স্পর্শে পরিপূর্ণ। তাঁর মিশ্রণের আরো কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে এ আলোচনা শেষ কোরছি।

'ওগো স্বপ্ন-স্বরূপিনী' গানটির সুরকে যদিও পরজ-বসন্ত বলা হয় তবু আসলে এটি বসন্তশ্রী, কেন না ঝোঁক কোমল রেখাব ও কোমল ধৈবতে। এটা শ্রীর লক্ষণ। এই মিশ্রণটি একেবারে নতুন। ঠিক সন্ধ্যের সুর শ্রীর সঙ্গে গভীর রাতের সুর বসন্তের মিশ্রণ হোয়েছে অথচ এ

মিশ্রণ কি রকম সার্থক হোয়ে উঠেছে তা রসবেত্তা মাত্রেই বুঝবেন। এই রকম 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গানটিতেও নতুন ধরণের মিশ্রণ দেখা যায়। এখানে মধ্য রাত্রির সুর বাহারের সঙ্গে শেষ বা প্রথম রাত্রির সুর পঞ্চমের মিশ্রণ হোয়েছে। 'আজি দক্ষিণ পবনে' ও আজি বরিষণ মুখরিত' গান দু'টিতে সোহিনী আর পঞ্চমের মিলন হোয়েছে। এরকম মিশ্রণও পূর্বে কেউ করেননি অথচ এর আশ্চর্য সার্থকতা নিয়ে প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অমনি কোরে তার সব সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ রূপ-সৃষ্টির আশ্চর্য-বৈচিত্র্যের দিয়েছেন।

রবীন্দ্রসংগীতে তানের স্থান

বাঙলাদেশে গানের একটি যে বিশেষত্ব আছে ও হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে তার যে একটি গোড়াঘেঁসা পার্থক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে দু-চারটির কথা এই আলোচনার প্রারম্ভেই বলে নেওয়া দরকার। হিন্দুস্থানী গানের মত বাংলার গান শুধু। সুরের খেলা নয়, বাংলার গান ভাবেরও ব্যঞ্জনা। বাংলা গান শুধু সুরের অলস রেখার আল্পনা নয়, রসাত্মক বাক্যেরও লীলাভূমি। বাংলার কীর্তন, পদাবলী, রামপ্রসাদী, লোকসঙ্গীত রবীন্দ্র-সংগীত এগুলি বিভিন্ন যুগের সৃষ্টি হলেও এ সবগুলির মধ্যে গান সম্বন্ধে বাঙালীর মনের একটি বিশেষ ধারণার নিসংশয় প্রমাণ আছে। সেই বিশেষ ধারণাটি হচ্ছে এই যে গান শুধু সুরের খেলা নয়, গান রস-সত্তা বাক্যেরও আধার। অর্থহীন রসহীন কথা কিংবা নিছক সারগম ব্যবহার করে রাগ-রাগিনীর প্রকাশ, আর যাদেরই আনন্দ দিক, বাঙালীকে দেয়না, দেবেও না কখনো। গানের কথাগুলি শুধু সুরের মহল দাঁড় করাবার কাঠামো মাত্র। একথা বাঙলার গান-স্রষ্টারা কখনো স্বীকার করেননি। এটা স্বীকার করবার দুঃসাহস এই স্রষ্টাদের ছিল না কেন না বাঙলার চাষী, জেলে, তাঁতী, কুমোর থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা পর্যন্ত কেউই রসাত্মক-বাক্য-বর্জিত গানকে কখনো বরদাস্ত করতে পারেননি, প্রাণের স্বীকৃতি জানাননি। আশা করা যাক যে ভবিষ্যতেও রসহীন বাকস্তুপকে বাঙালী গান বলে স্বীকার করবে না। এইটেকেই আমি বাঙালী মনের বিশেষত্ব

বলে মনে করি। রসের ক্ষেত্রে এটা তার নিজস্বতা, স্বকীয়ত্ব। গানকে বাঙালী শুধু সুরের অভিব্যক্তি বলে মনে করে না, গানকে রসাত্মক কথার সুরের মিলনভূমি বলে বাঙালী মনে করে।

বহু শতাব্দীর রসের পলি-পড়া বাঙালী মনের এই অভিনত্ব মনে না রাখলে বাঙালীর গান-সৃষ্টির মৌলিকত্ব ধরা সম্ভব হবে না।

গানে শুধু সুরের লীলার আস্বাদ পেয়ে বাঙালী খুসি নয়, গানের কথার রসের স্বাদ পাবার জন্য তার প্রাণ সদাই তৃষিত।

এইজন্যে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে বাঙলা গানে আর বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গানে, গানের কথাগুলিকে তাদের ভাগবতরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু সুরের বাহক হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। হিন্দীগানে গানের কথাগুলির ছন্দ, রূপ, গঠন সব ভেঙ্গে চুরে তাদের শুধু সুরের অবলম্বন, সুর ফোটাবার যান্ত্রিক অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শ্রোতারা শুধু সুরের খেলাই শুনতে আসেন। একটি শব্দকে তার বাঁধুনি থেকে আল্‌গা করে নিয়ে ওস্তাদ যখন তান লাগিয়ে সেই শব্দের ধ্বনিকে বিস্তারিত (বিকৃত) করেন তখন ধ্বনির অস্বাভাবক দীর্ঘত্বে বিরক্ত তো হনই না শ্রোতারা, বরং খুসী হন ওস্তাদের তানের কারিগরিতে। 'পিয়া বিনু নাহি আওত চয়েন' এর পিয়া-কে নিয়ে যে ধস্তাধস্তি সে ধ্বস্তাধস্তিতে পিয়া-বিরহকাতর বিরহীরও যেমন চয়েন নেই, তেমনি চয়েন নেই পিয়ার আর রস-সমজদার শ্রোতাদের। কিন্তু দরবারী সঙ্গীতের আসরে শব্দের ধ্বনির

ও শব্দের নিজস্ব রস-মাধুর্যের এই রসহীন বিকার শুধু যে সহ্য করা হয় তা নয়, তার তারিফও করা হয় যথেষ্ট। এটা সম্ভব হয়েছ এইজন্যে কেননা গান শুধু সুরের খেলা, গানের কথাগুলি শুধু সুর প্রকাশের অবলম্বন—এই হোলো হিন্দুস্থানী সংগীতের ওস্তাদদের অভিমত।

কিন্তু এই মতটি যদি বাংলা গানে লাগানো হয়, যেখানে গানের কথার কবিত্ব, লালিত্য, রস-উচ্ছলতা সুরের সঙ্গে মিলেছে, যেখানে গানের কথার ভাব-মাধুর্য্য সমাদৃত, তাহলে সে যে কী সর্ব্বনেশে পীড়াদায়ক হয়! "জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও, প্রিয়া"র প্রিয়াকে যদি তান দিয়ে, সুরের রসি বানিয়ে 'টাগ অফ ওয়ার করেন গায়ক, কখনো, প্রি·········করে টেনে, কখনো বা য়া······করে তান দিয়ে, তাহলে সে প্রিয়া জীবন-প্রদীপে আলো জ্বালতে ত পারবেই না, বাঙালী রসিকের হিয়াকেও সে প্রিয়া কখনো জিতে নিতে পারবে না। বাঙলা গানে তাই কথার নিজস্ব ধ্বনিকে, তার ছন্দকে যেমন তেমন করে ভেঙ্গেচুরে তান চালানোর প্রয়াস রসের দিক থেকে অনাসৃষ্টি। আর রবীন্দ্রনাথের গানে সেটাতো বটেই।

সাধারণভাবে বাঙলা গান সম্বন্ধে যা বলেছে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে সে সবই প্রযোজ্য। উপরন্তুও দু-একটি কথা বলবার আছে। এবারে সেই উপরন্তুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি। গানের কাব্যাংশ বাঙলা গানে উপেক্ষিতা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম ব্যঞ্জনা হচ্ছে গানের কথার সংগে গানের সুরের অনুপম মিলন। গানের কথাগুলি যে রসসৃষ্টি করছে, গানের সুর সেই কথার না-বলা অনির্বচনীয়ত্ব সুরের

অনির্বচনীয় আকুতির মধ্যে মুক্তি দিচ্ছে, মেলে ধরেছে। গানের কথাগুলিকে গানের সুর অবজ্ঞা করে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করছে না, কিম্বা কথাগুলি নিজেদের প্রাধান্য ঘোষণা করে সুরকে তাচ্ছিল্য করছে না। কথার ভাব, ধ্বনি ও ছন্দ, সুরের ভাব ও তার ছন্দের সংগে এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে গানের কাব্যাংশ যে লোকে গিয়ে পৌঁচেছে, রসের সেই নন্দনলোকে সুরের মন্দাকিনী সুরের অলখ ঢেউ দিয়ে কথাগুলিকে ঘিরে বয়ে চলেছে। কবিতার রস ও সুরের রস আলাদা হলেও রবীন্দ্রনাথের গানে এই দুই রসের মিলন ঘটেছে। গানের কথা ও সুর এক হয়ে গেছে অসামান্য সৃষ্টি-রসের রসায়নে।

তাঁর নিজের গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-- গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই।...তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁর কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

সংগীতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—সংগীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবল মাত্র ছন্দ মিষ্টি শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনায়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র। সে-দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"

তাই ভাবহীন সুরের খেলা গানে মরা জিনিষ। আর

ভাব বলতে এ ক্ষেত্রে গানের কথার ভাবকেই, তার কথার রস-ঘনত্বকেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন।

এই কারণেই বাংলা গানে তান দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার অবিশ্যি আমি সেই সব গানের কথা মনে রেখে এ কথা বলছি যে গানে রসাত্মক বাক্য আছে, যে সব গানে কথার দিক রসের দিক থেকে নিরর্থক নয়। একটিও মনে রাখা দরকার যে তান হচ্ছে সুরের অলঙ্কার। অলঙ্কার পরতে জানা চাই, পরাতে জানা চাই। অলংকার তো দেহকে আবৃত করবার জন্যে নয়, অলংকার হচ্ছে দেহের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। তাই অতি সংযত রুচি না থাকলে অলংকার পরায় বিপদ আছে। আমাদের দেশে রাজস্থানী মেয়েরা সেই বিপদের জ্বলজ্বলে প্রমাণ তাঁদের ললিত দেহে নিয়তই বহন করে ফিরছেন।

গানে তানের বেলায়ও তাই। গানের সুরের দেহে তানের অলংকার পরবার সময়ও খুব সংযমের প্রয়োজন। অতি সূক্ষ্ম রস-বোধ যাদের নেই, বেশীর দিকে যাদের ঝোঁক' বেশীটাকেই যারা সৌন্দর্য ও লাবণ্য ফুটিয়ে তোলবার উপ-করণ বলে মনে করে তাদের হাতে তান রসের প্রাণঘাতী যন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এর উদাহরণ দেবার প্রয়োজন আছে কি? বৈঠকা গানের যে কোন আসরে গেলেই তো তার মর্মান্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাই সুরের দেহে মূর্চ্ছনার অলংকার অতি সাবধানে অতি বিচক্ষণতার সংগে বাহুল্যবর্জিত শালীনতার সংগে পরিয়েছেন। রবীন্দ্র-সংগীতে তান জুড়ে গাওয়া চলবে না এই

নিয়ে বর্তমানে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সেই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তাঁর গানে যে সুর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, মূর্চ্ছানার যে কারুকার্যটুকু করেছেন তিনি তাঁর গানের সুরের দেহে, সেইটুকুতে খুসি না থেকে গায়ক তাঁর নিজের খেয়াল মতো জুড়তে পারেন কি না রবীন্দ্রসংগীতে, তার বিচার করা।

রবীন্দ্রনাথের গানে তান জুড়ে গাওয়ার স্বাধীনতা যাঁরা গায়কদের দিতে চান তাঁরা হিন্দুস্থানী সংগীতে, বিশেষ করে খেয়ালে তান দেওয়ার যে রেওয়াজ আছে তার নজির দেখিয়ে বলেন—তান দেওয়ার এই স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার বেলাতেও গায়কের থাকবে না কেন ?

তাই নিয়েই যখন এতো টানাটানি হাঁকাহাঁকি তখন তানের উৎপত্তির ইতিহাস ও সংগীতশাস্ত্রকারদের মতো হিন্দুস্থানী সংগীতে তানের স্থানটি ঠিক কোথায় সেটি সংক্ষেপে একটু দেখে নিলে মন্দ হয় না।

আধুনিক যুগে যে বস্তুটি 'তান' নাম নিয়ে হিন্দুস্থানী গানের আসর জমকে আছে, কারো মতে সেই 'তান' প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে আর সেটি নাকি আমাদের সংগীতের বিশেষত্ব। আসলে কিন্তু এই কথাগুলি প্রাচীনত্বের দাবীতে তান-কে স্বীকার করিয়ে নেবার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচীনত্বের এই দাবী একেবারেই ইতিহাস সমর্থিত নয়।

'রত্নাকর গ্রন্থে 'তান' শব্দের উল্লেখ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শারঙ্গদেব লিখেছেন—"গ্রামমূর্চ্ছনাক্রম তানাঃ" আর "একস্বরা দিতানানাং"। এর থেকেই সুস্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে

কোনো একটি স্বরের ব্যাপ্তিকেই তান বলা হোতো। এ তান আধুনিক কালে যা তান নামে প্রচলিত সে তান নয়। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকারদের মতে মূর্চ্ছনাযুক্ত স্বরসমষ্টির নাম হচ্ছে গ্রাম। নবম শতাব্দীতে প্রণীত মতঙ্গ-এর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেও 'অগ্নিষ্টোম', 'বাজপেয়', 'ষোড়শী', 'বাজসূয়', প্রভৃতি নানা তানের উল্লেখ আছে। মূর্চ্ছনার ব্যাপ্তি এই অর্থে এই সব তান ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব বর্তমান কালে যে অর্থে 'তান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে প্রাচীন কাল থেকেই 'তান' আমাদের সংগীতের অংশ —এই মতটি সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত ধারণা। অবিশ্যি একটি বস্তুর যথার্থতা কিম্বা সার্থকতা প্রমাণের জন্যে তার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি নে। কিন্তু এক ধরণের লোকদের কাছে প্রাচীনত্বই হচ্ছে একটি বস্তুর উৎকর্ষতার প্রমাণ। তাই প্রাচীনত্বের দাবীর দিক থেকেও তান-কে বিচার করে দেখা গেলো।

খেয়াল-এর যুগে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে অহোবলের সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থে "তান"-এর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

"তানাঃ স্যু মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়ুবিতী কৃতাঃ

মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুঃ। অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎ ক্রমোচ্চারিতশ্চ বাঃ।" এখানে আধুনিক তান-এর কথা নেই এবং বর্ণ অর্থাৎ মূল গান-ক্রিয়ার সঙ্গে তান ব্যবহারের নির্দেশ নেই। এখানে শুদ্ধ মূর্চ্ছনা ও অশুদ্ধ মূর্চ্ছনার বিচারে 'শুদ্ধতান' ও 'কূটতান' নির্দিষ্ট হয়েছে।

এরও পরবর্তী যুগে 'অভিনব রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে তান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"যেন বিস্তার্যতে রাগঃ স তানঃ কথ্যতে বুধৈঃ,
শুদ্ধ কূট বিভেদেন দ্বিবিধাস্তে সমীরিতাঃ।"

অর্থাৎ যার দ্বারা রাগের বিস্তার হয় তাকেই তান বলা হয়। এই বিস্তার কিন্তু স্বরের বাঁধা ছকের মধ্যে। ষড়জগ্রামের যাড়ব (ছয়স্বরযুক্ত) কিম্বা ঔড়ব (পঞ্চমস্বরযুক্ত), যে তানই হোক না কেন, স্বরগুলির পর্যায় ঠিক রেখে যে তান তাকেই 'শুদ্ধতান' বলা হয়েছে, তার অন্যথা হলে তাকে 'কূটতান' বলে নিন্দা করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তানের সীমা এতোই নির্দিষ্ট, তার বিস্তার এতোই নিয়ন্ত্রিত যে তানে সৃষ্টির মৌলিকত্ব দেখাবার অবকাশ খুবই অল্প, নেই বল্লেই চলে। যে অবকাশটুকু আছে সেটা সৃষ্টির নয়, কারিগরির।

তাই, একটি রাগের রূপ প্রকাশে গায়ক তাঁর মৌলিকত্ব প্রমাণ করেন তানের দ্বারা, এই মত যাঁরা পোষণ করেন, আমার মতে তাঁরা কারিগরিকে সৃষ্টি বলে ভ্রম করেছেন।

মৌলিকত্ব প্রমাণ করবার সুযোগ চান গায়কেরা? সে সুযোগ সব সময়েই আছে একটি গানের নির্দিষ্ট সুরের বুনুনির মধ্যেই। একই ধ্রুপদ, একই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভিন্ন গায়ক গেয়ে থাকেন, তাঁদের গাওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য নেই? রসের মন, সুরের কান যার তৈরী সে-ই অনায়াসে সে প্রভেদ ধরতে পারে। সেক্‌স্‌পীয়রের যে কোনো নটিকের যে কোন চরিত্র একই সময়ে বহু অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করে থাকেন। তাঁরা কি তাঁদের মৌলিকত্ব দেখাবার জন্যে নাটকের কথার সঙ্গে তাঁদের পছন্দসই কথা জুড়ে দেন? অথচ কী প্রভেদই না চোখে বাজে ও কানে ধরা পড়ে দুটি অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে!

তা'ছাড়া বৈঠকী সংগীতের চলনসই অভিজ্ঞতাও যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন যে তানের দ্বারা রাগ-রূপ ফুটিয়ে তোলার সম্ভাবনা থেকে রাগরূপ বিকৃত হবার দুর্ভাবনা অনেক বেশী। তান-বিস্তারের উন্মাদনায় সংযম হারিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ, সুরের পালোয়ানি দেখাবার কুরুচি—বৈঠকী সংগীতের আসরের একটি অতি সাধারণ দুর্ঘটনা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিন্দুস্থানী গানে তানের স্বাধীনতা একটা বাঁধা ছকের মধ্যেই আর তার অপব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছে। প্রাচীন সুর-শাস্ত্রকাররা যে অর্থে 'তান' এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই মূর্চ্ছনা অর্থে তানের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার আছে রবীন্দ্রনাথের গানে। বর্তমান কালে যে অর্থে তান শব্দটি ব্যবহৃত সেই অর্থে তান রবীন্দ্রসংগীতে নেই বল্লেও চলে।

আগেই বলেছি যে বাঙলা গান বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান নিরর্থক কথার সমষ্টি নয়, কথাগুলি ভাবের অতল ও অরূপ রসে টল্‌টল্ করছে। সেখানে কথার সঙ্গে সুরের এমনি নিরূপম মিলন যে সেখানে কমাবার কিম্বা বাড়াবার উপায় নেই, হ্রদ দীর্ঘ করবার উপায় নেই। যে তানটুকু রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন সে তানের বেশী তান জুড়তে গেলে গানের ভাবকে, আর গভীরতাকে আঘাত হানা হবে।

এই জন্যেই আমার মতে রবীন্দ্রনাথের গানে তান জুড়ে গাওয়া একেবারে অসম্ভব। হিন্দুস্থানী গানে সেটা চলে, তাও তার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মর্মান্তিক, কেন না বৈঠকী গানে কথার কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথের গানে কথার রস, অর্থাৎ গানের কাব্যরস এতোই গভীর, তার ভাব-ব্যঞ্জনা

এতোই অসীম যে সেই কথাকে সুরের জড়-বাহক করার কল্পনাও রসের দিক থেকে অপরাধ। তাছাড়া আর একটা কথাও ভেবে দেখবার আছে। যিনি রচয়িতা, তিনি গানের কাব্যাংশ আর গানের সুরের অংশ, এই দুটিরই অখণ্ড মিলিত রূপের রসোপলব্ধি করে তাঁর গান সৃষ্টি করেন। সেই সমগ্র রসোপলব্ধিই সকল রস-সৃষ্টির মূলে। কিন্তু যিনি গান গেয়ে থাকেন তিনি তো তিনি তো স্রষ্টা নয়, তাঁর তো স্রষ্টার রসোপলব্ধি নেই, তিনি তো সমগ্র রূপের ধারণা করেন নি। তিনি যখন অন্যের সৃষ্টির উপর নিজের বাহাদুরী ফলান তখন সেটা তো কারিগরির কৌশল মাত্র, কারিগরি দেখাবার চেষ্টা মাত্র, সেটা তো সৃষ্টি নয়। তাই যে গান-রচয়িতা গানের কথার ও সুরের সমগ্র রূপ অন্তরে উপলব্ধি করে গান সৃষ্টি করেছেন, শাস্ত্রকারেরা সে স্রষ্টাকে 'বগ্গেয়কারক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর গানে মোটা মনের কারিগরির খেলা দেখাবে সে যে সুর-স্রষ্টা নয়, যে শুধু গায়ক, অর্থাৎ যার সুর-সৃষ্টি-ক্ষমতা নেই, আছে শুধু সুরের শিক্ষা, আর আয়ত্ত আছে সুর খেলাবার কৌশল—এই ধারণা সৃষ্টির অসামান্যতার সঙ্গে কারিগরির নৈপুণ্যকে গুলিয়ে ফেলার মর্মান্তিক দীনতার পরিচয়।

পৃথিবীর কোনো দেশে স্রষ্টার রস-সৃষ্টির উপর অন্য লোকের হাত চালানোর অধিকার কোনো কালে নেই। কবির কবিতার উপর, শিল্পীর ছবির উপর, ভাস্করের মূর্তির উপর, গান রচয়িতার গানের উপর, সুররচয়িতার সুরের উপর অন্য লোক তার খেয়াল-খুসি মতো রঙ লেপে দেবে এ ব্যভিচার কোনো দেশের রসিক মানুষ কখনো সহ্য করে নি।

বেঠোভেনের 'সিম্ফনি', শোপাঁর 'নক্‌টার্ন', 'মিনুয়েট', মজার্কা, গ্রীগের 'পিয়ার গীন স্থইট', ব্রাম্, হাণ্ডেল, মোৎসার্ট প্রভৃতি—বিরাট স্থর-রচয়িতাদের রচিত স্থরে আটপৌরে লোক, কিছুটা স্থর জুড়ে তার বাহাদুরী দেখাবে রসের এ অশালীনতা পৃথিবীর কোনো দেশে চল্‌তি নেই।

স্রষ্টার অধিকার গায়কের নয় কেননা—"যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়। এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে কিন্তু সর্বদা মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিষটা খাদ হিসেবেই চলে, সোনা হিসেবে নয়। কিন্তু ওস্তাদেই হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। কেন না ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা এইজন্যে ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে স্থর-সভা ছেড়ে অস্থরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

তাই স্রষ্টার সৃষ্টির উপর মুন্সীয়ানা করবার অধিকার কারো নেই। গান-রচয়িতার গানের কথা যেমন বদল করবার অধিকার গায়কের নেই, তেমনি তার স্থরের রূপকেও বদল করবার অধিকার গায়কের নেই। কেন না গায়ক স্রষ্টা নয়, গায়ক স্থরের কৌশল-দক্ষ। রসের পরিমাণ-জ্ঞান গায়কের থাকতেও পারে। কিন্তু সেটা এক্ষেত্রে বিচারবস্তু নয়। যেমন একজনের কাব্য-বোধ থাকলেই রবীন্দ্রনাথের কিংবা সেক্সপীয়ারের কবিতার একটি শব্দ বদল করবার অধিকার তার থাকে না, কিংবা স্থর-

দক্ষতা থাকলেই বেঠোভেনের একটি সিমফনির সুরের অদল বদল করবার কিংবা শুবার্টের গানের সুর বদল করবার অধিকার জন্মায় না, ঠিক তেমনি লোকোত্তর প্রতিভাশালী এক মহাকবি, এক গান-রচয়িতা যে অসামান্য রসোপলব্ধির ফলে গান সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টির এতোটুকু অদলবদল করা সৃষ্টির মূলতত্ত্বকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু নয়।

স্রষ্টার রস-বোধ, রসের ওজন-বোধ, সৃষ্টির রূপের সমগ্র ও অখণ্ড উপলব্ধি—যার ফলে সৃষ্টি—সেটা যার সৃষ্টির প্রতিভা নেই, যে আটপৌরে লোক সে পাবে কোথা থেকে ? সুর সৃষ্টি করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। প্রত্যেকে সুর সৃষ্টি করে প্রমাণ দিক তার সৃজনী শক্তির, কিন্তু সৃষ্টির অজুহাতে অপরের সৃষ্টির উপর কারিগরি করবার বাহানা করার অধিকার কারো নেই।

সুর-স্রষ্টার সৃষ্টির উপর, তাঁর গানের সঙ্গে কিছু জুড়ে কারিগরি করবার অধিকার গায়কের আদবেই নেই।

এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানে, তাঁর গানের সুরের দেহে তানের স্ফীতিমা যোগ করতে দেওয়ার অধিকার গায়ককে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে রসের পূর্ণরূপ ধারণা করবার কিম্বা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যার নেই, যে স্রষ্টা নয়, যে শুধু সুর-কৌশলী, রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে সেই সুর-কৌশলী গায়কের কৌশল দেখাবার উপাদান বানানো।

শুধু রবীন্দ্রনাথের গান নয়, যে কোনো গান-রচয়িতার সুর-সৃষ্টির সঙ্গে কিছু জুড়ে দেবার অধিকার গায়কদের দেওয়া রসমেধ যজ্ঞের আয়োজন করার অধিকার দেওয়ার নামান্তর ॥

রবীন্দ্রসংগীতে সুরের ছন্দ

একটা সময় আসে যখন জীর্ণ ক্লান্ত প্রাণ তার স্রোত হারিয়ে ফেলে নিবীর্যতার চোরা বালিতে। বিস্ময় সরে যায় জীবনের কেন্দ্র থেকে। ম্লান চেতনার আবর্জনা জীবনকে কলুষিত করে। অলস ভোগের গ্লানি জীবনকে অশুচি করে।

তখন মানুষের প্রাণের প্রার্থনা হচ্ছে—হে নূতন, তুমি দেখা দাও। প্রবাহ আনো অন্তরে, স্থানুত্ব ঘুচুক। প্রাণের বন্যাপ্রবাহে জীবন শ্যামল হোক, সরস হোক, ফলন্ত হোক।

লক্ষ মানুষের প্রাণের ব্যাকুলতা, প্রাণের একান্ত কামনাকে সার্থক করে তখন দেখা দেন একজন মানুষ—যিনি নূতনের বাণী বহন করে আনেন। হাতে তাঁর নব জীবনের মশাল, তিনিই নব জীবনের মশাল। তিনি নব জীবনের স্রোত, নবজীবনের দখিনে হাওয়া, নবজীবনের অরুণ আলো।

তখন তাঁর আবির্ভাবে জীর্ণতা পরাজিত হয়, অচলতা দূর হয়, অন্ধকার ভৎসিত হয়।

তিনি সকলের হয়ে বিশ্বমানবের হয়ে প্রাণের বন্যাপ্রবাহ আনেন।

পঁচিশে বৈশাখ সেই রকম একজন অমিতবীর্যশালী পুরুষের আবির্ভাব দিন। তিনি প্রাণধারায় আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, প্লাবিত করেছেন।

সেই মহাকবি কালকে পরাজিত করেছেন। কাল তার গতিতে সব কিছুকে ধূলি করে চলে যায়। তাই অথর্ব বেদে

কালকে অশ্ব বলা হয়েছে যে অশ্ব তার খুরের আঘাতে সব কিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে চলে। শুধু কবিরা সেই কাল-অশ্ব' পরে আরোহণ করে চলেন ; কবয়ো বিপশ্চিতঃ—অনন্ত-স্পর্শী দৃষ্টি যাঁদের সেই কবিরা।

আমরা ধন্য যে সেই রকম কাল-জয়ী এক মহাকবি আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছেন ২৫শে বৈশাখ। আজ তাঁকে স্মরণ করে আমাদের সন্ধ্যের এই অনুষ্ঠান—রবীন্দ্র সংগীতের ছন্দ, সুরু করি।

কবিতার ছন্দ আর গানের ছন্দ—একই উপাদানে এরা গঠিত। মাত্রাই হচ্ছে ছন্দের সেই উপাদান। কবিতার কথাগুলির ঝোঁক আর গানে সুরের ঝোঁক ধ্বনি-উচ্চারণের কালকে মাত্রা দিয়ে ভাগ করে করে চলে। এই ঝোঁকগুলিই হচ্ছে এক একটি মাত্রা। কবিতা কিংবা গান শুনলেই এই ঝোঁকগুলি অর্থাৎ কবিতার কিংবা গানের ছন্দ আমাদের কানে বাজে। অবিশ্যি গানের সুরটা ছন্দে বাঁধা থাকা চাই তার জন্যে। অভ্যাস করে যে ছন্দের কান তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব তা' নয়। কিন্তু সে কান বাঁধা-ধরা মাত্রার অনুশাসন মানা সম্বন্ধে যতোটা সজাগ থাকে নতুন নতুন ছন্দের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার সিকির সিকিও সজাগ থাকে না। সেটা খুবই বোধগম্য কেন না ছন্দের কান তো আসলে ছন্দময় মন ছাড়া কিছু নয়। মন যখন শব্দগুলি নিয়ে আপন মনে খেলা করে, যখন শব্দগুলি সাজায় আপন মনের সৃষ্টির খেলাঘরে তখন মনের কানে বাজে কবিতার শব্দের ঝোঁক কিম্বা গানের সুরের ঝোঁকগুলি। তখন সেই শব্দগুলি কিংবা

সুরের মাত্রাগুলিকে নানাভাবে সাজিয়ে নানা ছন্দ সৃষ্টি করেন—যিনি কবি, যিনি গান-রচয়িতা। মাত্রাগুলিকে নানা ভাবে সাজানোর ফলেই নানা ছন্দ সৃষ্টি হয়। এই সাজানোর সময়ে যাতে ছন্দপতন না ঘটে, যাতে মাত্রাগুলির ওজন ঠিক থাকে তার জন্যে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে সুরের কান।

বাঙলা কবিতার ছন্দের আড়ষ্টতা, বৈচিত্র্যহীনতা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদা বাঙলার কবিতার জগতে রাজত্ব করতো পয়ার। ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে পয়ারের আড়ষ্টতা ঘোচালেন। রবীন্দ্রনাথ যুগ্ম বর্ণকে দু মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করে শব্দের মধ্যেকার ফাঁকটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত করলেন। এতে বাঙলা ছন্দ স্বাধীন হোলো, গতি পেলো, হাল্‌কা হোলো। আজ সন্ধ্যে বেলার এই আসরে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ছন্দ নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি নানা ছন্দের বিচিত্র অলংকার দিয়ে তাঁর গানের সুর-দেহকে কি ভাবে সাজিয়েছেন সেইটেই দেখাতে চেষ্টা করবো।

প্রথমে ধ্রুপদ রীতির ছন্দ দেখা যাক। বিলম্বিত গতির গানের মধ্যে ধ্রুপদ রীতির গানেই গানের কথাগুলির স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় রাখা সম্ভব। ধ্রুপদ গানে গানের কথার উচ্চারণ আর সুরের ছন্দ এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা চলে। সুরের প্রতি মাত্রায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় ধ্রুপদে। এখানে একটি মাত্রা হ্রস্ব আর একটি দীর্ঘ করে গাওয়ার বিধি নেই। মাত্রাগুলির সমতা সুরকে গম্ভীর ও গভীর করে তোলে।

বাংলা গানে ধ্রুপদাঙ্গ গানের সূত্রপাত হয় ব্রহ্মসংগীতে। শত শত ব্রহ্মসংগীত রচিত হয়েছে ধ্রুপদ রীতিতে। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—এঁরা বহু ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তাঁর পিতৃদেবের ও অগ্রজদের পথ অনুসরণ করে বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আদি ব্রাহ্মসমাজে তখন প্রসিদ্ধ গায়কেরা গান গাইতেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ-গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক। রবীন্দ্রনাথ তখন এই সব প্রসিদ্ধ গায়কদের কাছ থেকে দরকারী সংগীতের ধ্রুপদ শুনছেন ও নিজের লেখা ব্রহ্মসংগীতে সেই সব সুর বসাচ্ছেন। চমৎকার সব ধ্রুপদ রীতির গান সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে। গানের কথার স্বরবর্ণগুলি খুব অল্প অল্প টেনে উচ্চারণ করে, সুরের মাত্রার সমান ওজন রক্ষা করেছেন তিনি। কথার ধ্বনি সুরের ছন্দ রচনার জন্যে একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

এই ধ্রুপদ রীতির অসংখ্য গানের মধ্যে দু চারটি উল্লেখ করছি—

(১) প্রথম আদি তব
(২) তারে আরতি করে চন্দ্র তপন
(৩) বাজাও তুমি কবি
(৪) বাণী তব ধায়

গানের ও ছন্দের কবিতার ঐক্য

প্রথমেই বলেছি যে গানের ছন্দ-বৈচিত্র্য আসে সুরের মাত্রাগুলি নানা ভাবে সাজিয়ে। যেমন তিন তিন মাত্রার পরে পরে যদি সুরের ঝোঁক দেওয়া যায় তা হোলে এক ধরণের ছন্দ সৃষ্টি হয়। আবার চার চার মাত্রার পরে পরে ঝোঁক দিলে অন্য রকমের ছন্দ সৃষ্টি হয়।

| | | | | | | | | | | |
গ গ নে | গ গ নে | মে ঘে রা | জু টে ছে

এটা তিন মাত্রার একটি ছন্দ। কতকগুলি মাত্রার গুচ্ছ নিয়ে এক একটি পর্ব তৈরী হয়। এখানে তিন মাত্রার চারিটি পর্ব রয়েছে।

ঠিক তেমনি চার মাত্রার তিন পর্বে ভাগ করা হয়েছে—

| | | | | | | | | | | |
ক ত দি ন | ফু ল ভা বে | উ ড়ে যা বে

কবিতা আর গান দুয়েরই ছন্দ মাত্রা ও পর্ব দিয়ে তৈরী।

এখন চার মাত্রার ছন্দের একটি কবিতা আর একটি গান আর তিন মাত্রার ছন্দের একটি কবিতা ও একটি গান পরে পরে শুনলে ছন্দের ঐক্য ধরা পড়বে।

চার মাত্রা পর্বের একটি কবিতার এক লাইন শুনুন—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হোলো, যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা
তলোয়ার।

এবারে শুনুন চার মাত্রার পর্বের একটি গান—

আমার সকল রসের ধারা তোমাতে হোক না হারা।

এবারে তিন মাত্রা পর্বের একটি কবিতা শুনুন—

বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায় চৈৎ ফসলের শূন্য ক্ষেতে
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে
আয় রে, ওরে মৌমাছি আয়
চৈত্র যে যায় পত্র-ঝরা
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

শুনুন এবারে তিন মাত্রা পর্বের একটি গান—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

আমরা দেখলুম যে চার মাত্রার বা তিন মাত্রার একই ছন্দ কবিতা ও গানে ধ্বনিত হতে পারে। কথার ছন্দ ও সুরের ছন্দ এই দুটির যদি মিলন ঘটে তা হোলো সে মিলনের অনুপম মাধুরী ও রস হৃদয়কে স্পর্শ করে। দরবারী সংগীতে গানের ছন্দ কথার ছন্দকে একেবারে উপেক্ষা করে চলেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে হিন্দুস্থানী গানে গানের কথার কোনো মুল্য নেই কবিতা হিসেবে। কথাগুলি সেখানে শুধু সুরের মহল খাড়া করবার ভারা মাত্র। কিন্তু কবিতাই হচ্ছে সুরের দেহ। কবিতাকে অবলম্বন করে গান। কবিতার ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গানের সুরের ভাব ও ছন্দের মিতালি ঘটাতে পারলে গান সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ এই মিতালি ঘটিয়েছেন গানের কথার সঙ্গে গানের সুরের।

কিন্তু সব সময়েই যে সেটা ঘটতে হবে তা নয়। একটি জিনিষ মনে রাখা দরকার। কবিতায় কথা বলবার স্বাভাবিক ধরণটি প্রায় ঠিকই থাকে, কিন্তু সেই কবিতাটিই যখন সুরের বাঁধনে ধরা দিয়ে গানের রূপ নেয়, তখন কবিতার কথাগুলিকে সুরে বসিয়ে কখনো টেনে বড়ো করে কখনো বা ছোটো করে বল্‌তে হয়। তখন কথার স্বাভাবিক উচ্চারণ যায় বদলে। সুরের ছন্দ তখন কবিতার ছন্দ থেকে আলাদা হয়ে নিজের পথে চলে। মনে রাখা দরকার যে কবিতার ছন্দ হচ্ছে কথা উচ্চারণের ধ্বনি-বিন্যাসে আর সুরের ছন্দ হচ্ছে সুরের ধ্বনি-বৈচিত্র্যে। একটি কবিতা যেই সুরের অলখ ডোরে আপনাকে বাঁধা দেয়, সুরের

কাছে আত্মসমর্পণ করে গান-রূপ নেয়, অমনি কবিতার ছন্দ আপনাকে সরিয়ে নেয়। তখন গানের ছন্দের উপরেই কবিতার ছন্দ রক্ষা করবার সব দায়িত্ব এসে পড়ে। কবিতার তার নিজস্ব ছন্দ সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দেয়। তখন কবিতায় কথার ছন্দ থাকে না, থাকে শুধু গানের সুরের ছন্দ।

যেমন দেখুন—

হৃ দ য় | আ মা র | না চে রে | আ জি কে
ম য়ূ রে | র ম ত | না চে রে।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।

ত্রৈমাত্রিক ছন্দের এই কবিতাটি যেই গানের রূপ নিলো তখন তার কথার ছন্দের রূপ একেবারে পরিহার করে সে সুরের ছন্দের নব রূপ গ্রহণ করলো।

গতি তো শুধু বাইরের জিনিষ নয়, গতি অন্তরের আবেগের প্রকাশ। অন্তরের রূপ ধরা পড়ে গতিতে। গানের ছন্দের গতি নির্ভর করে মাত্রাগুলির দ্রুত উচ্চারণে কিংবা মাত্রাগুলির টেনে টেনে উচ্চারণে। মাত্রার ঝোঁকগুলি তাড়াতাড়ি দিলে গানের ছন্দ বেগবান হয়, দ্রুত হয়, আর ঝোঁকগুলি টেনে টেনে দিলে ছন্দের গতি বিলম্বিত হয়। সুরের ছন্দ যখন দ্রুত তখন গানে কথার আধিক্য, সুরের প্রতি মাত্রা তখন এক একটি কথার ধ্বনিতে স্পষ্ট হয়ে বাজে। আর সুরের চলার ছন্দ যখন

মন্দাক্রান্তা, সুর যখন গড়িয়ে চলেছে তখন গানে কথার ভাগটা কম। সুর তখন কথার স্বল্পতাকে সুর দিয়ে ভরাট করে চলে।

এর থেকে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে। একটি হচ্ছে এই যে গানের সুরের গতি দ্রুত হলে, মাত্রাগুলির গুচ্ছ দিয়ে তৈরী পর্বের মধ্যে কথার ঠাসবুনুনি থাকতে বাধ্য। তখন পর্বের উপর ঝোঁক পড়বে, প্রতিটি মাত্রার উপরে নয়, আর এই দ্রুত ছন্দে গানের কাব্যাংশের ভাব ও ছন্দ অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে।

আর গানের ছন্দের গতি যদি এলায়িত হয়, সে গতির ভঙ্গী যদি হয় দীর্ঘ আর শিথিল, তা হোলে সেই বিলম্বিত গতির গানে গানের ছন্দের প্রতি মাত্রায় ঝোঁক পড়বে, গানে কথার বুনুনি হবে শিথিল, সেই স্বল্প কথাগুলির ফাঁক ভরাট হবে সুর টেনে টেনে, আর তার ফলে গানের কাব্যাংশের ভাব তার গভীরতা ও রূপের স্বকীয়ত্ব খোয়াবে আর তার ছন্দ গৌণ হয়ে পড়বে।

দ্রুত ছন্দের একটি গান আর বিলম্বিত ছন্দের একটি গান— এই দুটি গান উদাহরণস্বরূপ ধরে দিয়ে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার করি।

প্রথমে নেওয়া যাক দ্রুত ছন্দের—ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে —গানটি। এই গানটিতে গানে কথার ছন্দ গানের সুরের ছন্দের সঙ্গে মৈত্রী করেছে। সুরের ছন্দ গানের কথার ছন্দকে আঘাত হানে নি, লাঞ্ছিত করে নি।

তারপরে দেখুন বিলম্বিত ছন্দের—বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী—

গানটি। এই গানে গানের সুরের ছন্দের অনেক মাত্রা শুধু কথা-হীন সুরের ঝোঁক দিয়ে ভরে তোলা হয়েছে। সমান ওজনের চার মাত্রার ছন্দের এই গানটিতে কথার ভাগটি কম। তাই 'বাসন্তী'-র 'রস' অংশটিকে আর 'মোহিনী'-র 'মা' অংশটিকে সুরে টেনে চার মাত্রার পর্ব পূরণ করা হয়েছে। 'বাসন্তী' শব্দটির 'বাস' অংশ থেকে 'ন্তী' বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যেমন সুর টানার ফলে 'মোহিনী' শব্দের 'মো' 'হিনী' আল্‌গা হয়ে গেছে। গানের কাব্যাংশের বাঁধুনি এই গানটিতে বিশেষ আঁটসাঁট নয়। এই গানটির ধরণ অনেকটা হিন্দুস্থানী দরবারী গানের মতো। গানের সুরের ছন্দ গানের কথাগুলির ছন্দকে, কথার বাঁধুনীকে উপেক্ষা করে নিজের প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত। গানের ছুটি অংশের মধ্যে এই বিরোধের ফলে গানটি নিজের সার্থক রূপ ফোটাতে পারে নি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিলম্বিত ছন্দের গানে গানের কথাগুলির ছন্দ আর গানের সুরের ছন্দ—এই ছুটির মধ্যে যে মন কসাকসি ও বৈরী ভাব সেটাকে দূর করা যায় কি যায় না। দূর করা যায় সুরের ছন্দের সঙ্গে কথার এই বৈরী ভাব, যদি বিলম্বিত ছন্দের গানে সুরের মাত্রার ঝোঁকগুলি অতো বিকট প্রবলতার সঙ্গে না দেওয়া হয়। যদি মোলায়েম ভাবে একটু পেলব স্নিগ্ধভাবে ঝোঁক দেওয়া হয় তা হোলে গানের কথার ছন্দ এমন ভাবে ধর্ষিত হয় না, যেমন ভাবে ধর্ষিত হয়ে থাকে হিন্দুস্থানী বৈঠকী গানে। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'বেদনা কি ভাষায় রে' প্রভৃতি গানে সব কটি মাত্রায় কিম্বা প্রতিটি পর্বের আরম্ভে আর শেষে ঝোঁক নেই। কেবল

ছন্দ-প্রবাহের মোট সময়টুকু ঠিক রাখা হয়েছে। গানের কথাগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করে, কথার রেশ টেনে, শুধু সুর টেনে টেনে নয়, ভরাট করে ছন্দ রাখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের পরীক্ষার মধ্যে বিলম্বিত লয়ে খেয়াল বাঙলা গানে কি ভাবে রচনা করা সম্ভব তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিলম্বিত লয়ের হিন্দুস্থানি খেয়ালে সুরের বিস্তার যে পদ্ধতিতে চলে সেই পদ্ধতিতে খেয়ালের কথাগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। গানের কথাগুলিকে যেমন তেমন করে আল্‌গা করে নিয়ে ওস্তাদ তান দেন। 'পিয়া'র 'পি'-তে তান লাগিয়ে অবশেষে যখন 'য়া'তে এসে পৌঁছলেন ওস্তাদ তখন ওস্তাদের হাতে পড়ে 'পিয়া'ই যে শুধু নাজেহাল তা নয় রসিক শ্রোতা মাত্রেই নাজেহাল। সুর বিস্তারের নামে সুরের এই যে লঙ্কাকাণ্ড চলে এটা হিন্দুস্থানী গানের শ্রোতাদের ভালো লাগতে পারে, বাংলা গানের শ্রোতাদের পক্ষে এই ধরণের সুরবিস্তার গানের ভাব ও রসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। কথার অর্থ ও ছন্দ বজায় রেখে কথাগুলিকে হাস্যকরভাবে টুকরো না করে কি করে কথার রেশকে সুরে টেনে বাঙলায় খেয়াল গান রচনা করা যায় তার পথ রবীন্দ্রনাথ করে দিয়েছেন ভবিষ্যৎ-এর গান রচয়িতাদের জন্যে।

বিলম্বিত ছন্দে তিনি অনেক গান তৈরী করেছেন, যথা—

কার বাঁশী নিশি ভোরে, কোথা যে উধাও হোলে,
সখি আঁধারে একেলা ঘরে।

তা'ছাড়া তিনি এমন অনেক গান রচনা করেছেন যে গানগুলিতে গানের কথাগুলির ছন্দ আর গানের সুরের ছন্দ

একেবারে এক হয়ে গেছে। যেমন—খর বায়ু বয় বেগে, গগনে গগনে ধায় হাঁকি, হিমের রাতের ঐ গগনের, শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন প্রভৃতি গানগুলি। এই গানগুলি কবিতা হিসেবে আবৃত্তি করলে যে ছন্দ কানে বাজে গান হিসেবে গাইলে সেই একই ছন্দ বাজে। এগুলি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি।

এই ধরণের একটি গান হচ্ছে—

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষ-হিন্দোলে মিলন স্বপ্নে সে কোন আতিথিরে।

এবারে যে যে উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন সেগুলি এক এক করে ধ'রে দিচ্ছি।

(ক) ভাবের উপর লক্ষ্য রেখে ছন্দ-বৈচিত্র্য

ছন্দের নিজস্ব একটা ভাব-রূপ আছে। ছন্দের অচঞ্চল গতি আর ছন্দের বেগবান বিদ্যুৎগতি—এই দুটি গতি দুটি বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করে অন্তরে, দুটি বিভিন্ন ভাব-রূপ গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নিজস্ব ভাব-রূপকে কখনো ক্ষুণ্ণ করেন নি। গানের সুরের ছন্দের ভাবের সঙ্গে গানের কথার ভাবকে তিনি অনুপম নিপুণতার সঙ্গে মিশিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিতে ছন্দগুলির বিশেষ বিশেষ রূপের সাহায্যে ভাব প্রকাশের বিচিত্রতা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

যেমন 'কাল মৃগয়া'-তে—"আর নহে আর নহে" "কাল

সকালে উঠবো মোরা", 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-তে "আয় সাথে আয়", আর 'বসন্ত' গীতিনাট্যে—"ধীরে ধীরে বও" গানগুলি।

আবার যেখানে পৌরুষ, উচ্ছ্বাস ও উল্লাস গানে ফুটিয়েছেন যেমন 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী' 'আমরা নূতন যৌবনেরি দূত', 'শীতের হাওয়ায় লাগানো নাচন', 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে', 'আমি তারেই জানি তারেই জানি' ইত্যাদি গানগুলিতে—সেখানে ছন্দের গতি আর ভাবময় রূপের ব্যবহার করে অপরূপ সব গান সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

(খ) যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে ছন্দ-বৈচিত্র্য

যে কবিতায় যুক্তাক্ষরের ছড়াছড়ি সে কবিতাটি সুর বসিয়ে গান সৃষ্টি করবার উপযোগী নয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গানের ছন্দের পর্বে বা মাত্রায় বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্যে যুক্তাক্ষর-যুক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন। গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা ও ভাবের সবল দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে তিনি যুক্তাক্ষর-যুক্ত শব্দ ব্যবহার করে ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার তুলেছেন।

'সর্ব খর্বতারে দহে', 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে', 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল', 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়', 'নীলাঞ্জন ছায়া', 'বিশ্ববীণারবে', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', 'নীল অঞ্জন ঘন' প্রভৃতি গান যুক্তাক্ষরের ধ্বনির মিশ্রণে এক অভিনব রূপ লাভ করেছে।

(গ) কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ছন্দের বৈচিত্র্য

আমরা আগেই দেখেছি যে তিন মাত্রার বা চার মাত্রার গুচ্ছ বেঁধে বেঁধে এক এক রকমের ছন্দের কাঠামো তৈরী হয়। ছন্দের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য নির্ভর করে কিন্তু ধ্বনি-বৈচিত্র্যের উপর।

ধ্বনি-বৈচিত্র্য হোলো ছন্দের অলংকার। আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি ধ্বনি বৈচিত্র্য এবং ধ্বনি-সংখ্যার সমতা, মিল ও গরমিল কথার এক একটি ছাঁদ তৈরী করে। সেই ছাঁদের (pattern) সূক্ষ্ম কারুকার্যই হচ্ছে ছন্দের অলংকার। 'এসো হে বৈশাখ' এই গানটি নিয়ে এই ধ্বনি-বৈচিত্র্যের একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথম চার মাত্রায় 'তাপস' ও পরের চার মাত্রায় 'নিশ্বাস' এই কথা দুটির ধ্বনি মিল সৃষ্টি করেছে ঠিক পরের চার মাত্রায় 'বায়ে' কথাটির ধ্বনি গরমিল এনেছে। ফলে, 'তাপস নিঃশ্বাস বায়' কথা কটি মিলে ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। আবার 'দূর হয়ে যাক্ যাক্' কথাগুলির ধ্বনি ছন্দের ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করছে।

'বাজোরে বাঁশরী বাজো', গানটিতেও 'মধুকর-পদভর-কম্পিত-চম্পক' এই কথাগুলির অপূর্ব গুচ্ছ-গাঁথা ধ্বনির দ্বারা ছন্দের নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন।

(ঘ) কথার বিভিন্ন অংশে ঝোঁক দিয়ে ছন্দ-বৈচিত্র্য

পর্বের আরম্ভে শব্দের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক না দিয়ে শব্দের পরবর্তী অক্ষরগুলির যে কোনটিতে ঝোঁক দিলে ছন্দ বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথ গানের ছন্দে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

|　|　|　|　|　|　|
দখিন হাওয়া জাগো, তুমিই তো সেই যাবেই চলে,

|　|　|　|　|　|　|
হৃদয়ের এ কূল ও কূল, উতল ধারা বাদল ঝরে,

'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়' প্রভৃতি গানে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে আর 'রুদ্র বেশে কেমন খেলা' ইত্যাদি গানে চতুর্থ অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে গানের বিচিত্র ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) সুরের ছন্দের বিভিন্ন মাত্রায় কথার বিরামে ছন্দ-বৈচিত্র্য

সুরের ছন্দের মাত্রায় কথা না থাকলে সেখানে ঝোঁক পড়ে না। সেখানে বিরাম সৃষ্টি হয়। এই ভাবে নানা ধরণের বিরাম সৃষ্টি করে সুরের বৈচিত্র্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যেমন ফু—লে ফু—লে ঢ—লে ঢ—লে, এই তিন মাত্রার ছন্দের গানে মাঝের মাত্রায় বিরাম দিয়েছেন। আবার 'হা রে রে রে রে রে' এই তিন মাত্রার ছন্দের গানে তৃতীয় মাত্রায় বিরাম। 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া' এই গানটিতে দুই মাত্রায় বিরাম—ধী-রে। ধী-রে। ধী-রে। বও ইত্যাদি। আবার কোনো গানে একই লাইনে দু রকমের বিরামের বুনুনি রয়েছে যেমন 'গোধুলি লগন এলো' গানটিতে। এখানে গোধুলি শব্দটির গো-এর পর বিরাম। কিন্তু লগন শব্দটির ল আর গ এই দুয়ের পরে পরে বিরাম। এই বিরামের হেরফের করে নানা গানে যেমন 'বৃষ্টি শেষের হাওয়া', 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' প্রভৃতি গানে সুরের ছন্দে নানা আল্পনা এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

(চ) মাত্রার বিন্যাসে ও তালের বিভিন্নতায় ছন্দ-বৈচিত্র্য

কতকগুলি মাত্রার সমষ্টি নিয়ে এক একটি তাল সৃষ্টি হয়। এই মাত্রার সমষ্টিগুলি ঢেউয়ের মতো আসা যাওয়া করতে থাকে ও আবর্তিত হতে থাকে সুরের ছন্দের মধ্যে। যেমন ঝাঁপ-

তালে দশ মাত্রার, ত্রিতালে ষোলো মাত্রার আর চৌতালে বারো মাত্রার আবর্তন হয়।

প্রচলিত তালগুলিতে যথা ত্রিতাল, চৌতাল, ধামার, দাদরা তেওড়া প্রভৃতিতে গান রচনা তো করেছেনই, এ ছাড়া ঝম্পক, রূপকড়া, নবতাল, নবপঞ্চ, একাদশী, ষষ্ঠী প্রভৃতি কতকগুলি নতুন তালও সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এসব তালগুলি মাত্রা সংখ্যার নতুন নতুন গুচ্ছ-বাঁধার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন 'এবার এলো সময় রে তোর', ,শ্যামল ছায়া নাইবা এলে' গান দুটি ২+৪ এই মাত্রায়, 'কাঁপিছে দেহলতা'—৩।৪।৪ এই এগারো মাত্রা গুচ্ছে একদাশী তালে রচিত। 'যেতে যেতে একলা পথে' আর 'কোথায় আলো ওরে কোথায় আলো' গান দুটি ৩।২ মাত্রার ঝম্পক তালে, 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' এটি ৩+২+৩ আট মাত্রার রূপকড়া তালে 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলো' এটা ৫+৫ মাত্রার তালে আর 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' এটি ৩+৬ মাত্রার নবতাল-এ।

পরে এইটিকে অন্যেরা ৪।৫ মাত্রায় ভাগ করেছেন। তারপরে দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দেওয়া তালও সৃষ্টি করেছেন, যেমন—'তুমি তো সেই,' 'পূর্ণচাঁদের মায়ায়,' 'দক্ষিণ হাওয়া জাগো জাগো।'

তাল ফেরতায় ছন্দ-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথ নানান উপায়ে গানের ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছেন—যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে ছন্দের ঝোঁক দিয়ে, কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যের দ্বারা, কথার বিভিন্ন অংশে ঝোঁক দিয়ে, সুরের ছন্দের বিভিন্ন মাত্রায় বিরাম সৃষ্টি করে ও মাত্রার বিন্যাস তালের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন গানের ছন্দে। এ ছাড়া একই

গানের ভাবের পরির্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার বদল করেছেন। এই রকম অনেক গান তিনি সৃষ্ট করেছেন যেখানে ভাবের পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি রেখে একই গানে তিনি নানা তাল মিশিয়েছেন। গানের এক অংশে এক তাল, অন্য অংশে সম্পূর্ণ অন্য তাল। যেমন—'মধু গন্ধে ভরা,' 'ওগো কিশোর আজি,' 'নৃত্যের তালে তালে,' 'বিশ্ববীণারবে' প্রভৃতি গানগুলিতে। বিশ্ব-বীণারবে গানটিতে তালের হেরফেরের পরিচয় আপনারা পাবেন।

আজ সন্ধ্যের আসরে রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ নিয়ে আলোচনা করলুম। রস-সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখাতে চেষ্টা করলে সৃষ্টির কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়, রস সরে যায়। এটা মনে রাখতে হবে যে সৃষ্টি হচ্ছে একটি অখণ্ড ও সম্পূর্ণ প্রকাশ। তার উপাদানগুলিকে পৃথক করে দেখলে রস পাওয়া যায় না, কেননা সেই উপাদনগুলির একটি বিশেষ মিলনের ফলে রসের সৃষ্টি। প্রিয়ার আঁখির যে অনির্বচনীয় আবেশ, যে আঁখির মধ্যে অকাশের অসীমতা দেখেছেন কবি, যে আঁখি-পল্লবের সৌন্দর্য সন্ধ্যার বর্ণনায় কবি ব্যবহার করেছেন,—"একদিন অন্ধকার নামিত নীরবে, প্রেম-নত নয়নের স্নিগ্ধ-ছায়া সম, দীর্ঘ পল্লবের মতো," সেই আঁখি আর আঁখিপল্লবকে যদি মেডিকেল কলেজের ডিসেক্শন্ রুমে পাঠিয়ে প্রতিটি অংশ টুকরো করা হয় তা হোলো সে আঁখি, সেই আঁখির তারকা ও তার দীর্ঘ পল্লব যে কী বিভীষিকা সৃষ্টি করবে তা বলা যায় না।

তেম্নি কবিতায়, অর্থ, ধ্বনি, বাঁধুনি, ভাব সব মিলিয়ে কবিতা। এর কোন একটি উপাদান কবিতা নয়, সব মিলিয়ে

সেই চমৎকারিত্বের আবির্ভাব যেটি কবিতার প্রাণ। গানেও ঠিক তাই। গানের কথা, ধ্বনি, সুরের ছন্দ, ভাব—এই সব মিলে গান। বোঝবার জন্যে ও বোঝাবার জন্যে কবিতাকে কিম্বা গানকে তার উপাদনে ভাগ করে দেখতে আপত্তি নেই, শুধু মনে রাখতে হবে-যে রস—যেটি সৃষ্টির প্রাণ যেটি না থাকলে সৃষ্টি সৃষ্টিই নয়, নিছক অনাসৃষ্টি, সেই রস উপাদনগুলির কোনো একটির মধ্যে নেই। উপাদানগুলির মিলনের ফলে রসের উৎপত্তি। তাও সব মিলনে, যেমন তেমন করে মিললেই রস আসে না, কবিতা রসময় হয় না, গান মনকে রসের আবেশে স্নিগ্ধ করে না। অতীতের ও বর্তমানের বহু কবিতা ও গান রসের দিক থেকে তাদের নিরর্থকতার ও বিফলতার প্রমাণ দিয়েছে—সবই আছে অথচ কিছুই নেই। কেননা রস নেই।

আজ রসের দীক্ষা নেবার দিন, প্রাণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্রাণের অনবগুণ্ঠিত মুখখানি দেখবার দিন। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের সেই রসের দীক্ষা দিক।

বাঙালীর প্রাণ নানা ঝোড়ো অবস্থায় আজ রসহীন, তার জীবন রসশূন্য, তার বাক্য রসহারা। তাই বাঙালীর সৃষ্টি তার আবেগ আজ সবই ব্যর্থ হচ্ছে।

শুষ্কতা বীর্য নয়, শুষ্কতা দুর্বলতা। শুষ্কতাকে দূর করে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আবেগ সবকে অন্তরের রসের দ্বারা প্রজ্বলিত করে আমরা এগিয়ে চলি। রবীন্দ্রনাথের গান সেই অপরাজেয় শক্তি সঞ্চার করুক আমাদের অন্তরে।

বৈতানিক উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে প্রদত্ত ভাষণ (২৫ শে বৈশাখ ১৩৬১ সাল)

রবীন্দ্রনাথের গান ও বাংলার লোক-সংগীত

যা সকলের, সকলের জন্যে যা চারিদিকে ছড়ানো আছে তাকে নিজের করা, আবার যা নিজের করা হয়েছে তাকে সকলের করা এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির মূল রহস্য। উপাদান, নিজস্বীকরণ ও সাধারণীকরণ। উপাদান চারিদিকে ছাড়ানো—বাতাস, জল, আলো। সকালের আলো ঝরণার মতো ধুয়ে দেয়, সন্ধ্যার আলো যেন যমুনার জল, বাতাস সে যেন পাখী নরম ডানা মুখে বুলোয়। এ উপাদানগুলি সব ফুলের জন্যই আছে, কোন বিশেষ ফুলের একচেটিয়ে এগুলি নয়। এই উপাদানগুলিকে কিন্তু একান্ত ভাবে নিজের করে নিয়ে গোলাপ গাছ গোলাপ ফুটোয়। তা যদি না নিতো তা হলে গোলাপ গাছে গোলাপ না ফুটে মাকাল ফুটতে পারতো। তাই উপাদানগুলিকে নিজের বিশেষ রসে জারিয়ে নিজের করে নেওয়া, যতটুকু প্রয়োজন সেই বিশেষ সৃষ্টির জন্যে শুধু ততটুকু নেওয়া, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির একটি নিয়ম। আবার এই একান্ত নিজের করে নেওয়াটাকে যদি এমন একটা রূপ না দেওয়া যায় যা সকলের গ্রাহ্য হবে তা হোলে সে রূপ-সৃষ্টি ব্যর্থ হয়। গোলাপ ফুল যদি শুধু গোলাপ গাছেরই গ্রাহ্য হোতো তা হোলো তার আদর কখনো এতো হোতো না। গোলাপ এমন একটা রূপ পেলো যা সকলের মন হরণ করলো।

প্রকৃতির সৃষ্টির মতো সামাজিক সৃষ্টিতেও সেই একই কথা। অগুণ্‌তি সমস্যা সমাজের জীবনে বিদ্যমান। আর

সেই সমস্যাগুলি সকলের সমস্যা। সমাজ-সংস্কারক এই সমস্যাগুলি থেকে উপদান নিয়ে নতুন স্বষ্টির পরিকল্পনা করেন। সেই নতুন স্বষ্টি—যেটা একান্তভাবে তাঁরই স্বষ্টি, সেটা যদি শুধু সমাজ-সংস্কারের গ্রাহ্য হয় তা হলে সব নিস্ফল হয়ে যায়। সেটা যখন বহুজনের গ্রাহ্য হয় তখনই নতুন সামাজিক বিধানের স্বষ্টি হয়।

সাহিত্য, শিল্প, গান এদের স্বষ্টির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম চোখে পড়ে। উপাদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, যার ক্ষমতায় যা আছে সেই তুলে নিতে পারে। উপাদান যেন ফুলের রেণু, তাই দিয়েই তৈরী হয় স্বষ্টির মধু। কোনো মৌমাছি নেয় কেতকীর কেশর, কেউ নেয় জাফরাণের রেণু। কিন্তু উপাদান সংগ্রহ করে নিলেই তো গড়া যায় না। উপাদানগুলিকে নিজস্ব করে নিতে না পারলে স্বষ্টি নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে শিব গড়তে বাঁদর গড়া হয় তার কারণই হচ্ছে এই যে উপাদানগুলিকে স্রষ্টা নিজস্ব করে নিতে পারে নি। এর উত্তরে কেউ হয়তো বলবেন যে স্রষ্টা নিজস্ব করে নিয়েছেন বলেই বাঁদর স্বষ্টি হয়েছে, নইলে শিবই স্বষ্টি হোতো। এটা ঠিক কথা নয়। স্বষ্টির ক্ষেত্রে নিজস্ব করে নেওয়ার মানে হচ্ছে যা স্বষ্টি করতে যাওয়া হচ্ছে তারই রূপ ফুটিয়ে তোলা। শিব গড়তে গিয়ে শিবই গড়তে হবে, বাঁদর গড়তে গিয়ে বাঁদরই গড়তে হবে। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়বে না, বাঁদর গড়তে গিয়ে শিব গড়বে না। ফুল গড়তে গিয়ে হাতী গড়বে না, চোখ গড়তে গিয়ে ল্যাজ গড়বে না। একে নিজস্ব করা বলে না স্বষ্টির ক্ষেত্রে। একে বলে নিজের কামনার ক্লেদ মাখানো বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। স্বষ্টির নিয়মে নিজস্ব করা

মানে হচ্ছে একটি বস্তুর বিশেষ রূপ, তার বিশেষ ভঙ্গিমা, তার বিশেষ প্রকাশকে ফুটিয়া তোলা নিরাসক্ত প্রাণের রসে জারিয়ে। প্রাণের সহজ রস দিয়ে বস্তুর বিশেষ রূপকে ফোটানোই হচ্ছে নিজের করে নেওয়ার অর্থ। কোনো কিছুকে নিজের করে নেওয়ার অর্থ যদি হয় এমন রঙ চাপানো সেই বস্তুর দেহে যা স্রষ্টা ছাড়া আর কারো বোধগম্য নয়, আর কারো হৃদয় স্পর্শ করে না, তা হোলে সেই সৃষ্টি সকলের ভালো লাগতো কি করে? চাঁদ সবাই দেখে, আর যুগ যুগান্তর থেকে কবি মাত্রেই চাঁদকে হয়রাণ করে চলেছেন চাঁদের উপর কবিতা লিখে। একটি কবির কবিতা পড়লে প্রাণ দুলে ওঠে, মনে হয় সত্যিই তো, এতো আমারই মনের কথা। আর এক জনের কবিতা পড়লে মনে হয় এতো আমার মনের কথা নয়। এ শুধু তারই কথা। কবিকে তাই একটি অনুভূতিকে নিজের করে নেওয়ার পর তাকে সকলের করে দিতে হয়। একেই আলংকারিকেরা কলেন—'সাধারণীকৃত'—অর্থাৎ একান্ত ভাবে যেটা নিজের অনুভূতির বস্তু তাকে সকলের রসের বস্তু করে সৃষ্টি করা। এই সকলের করে দেওয়াটা কিন্তু সকলের কাজ নয়, এটা একান্তভাবে স্রষ্টার কাজ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আজি সাঁঝের যমুনায়, নতুন চাঁদের কিরণ-তরী কোথায় ভেসে যায় গো।' শুনেই মনে হয়, সত্যিই তো তাই, চাঁদের কিরণ-তরী তো ভাসে সাঁঝের যমুনায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কোন্ স্বপ্নের ঘোরে, চাঁদ ভেসে যায় আকাশ'পরে।' শুনেই মনে হয়, তাই তো, স্বপ্নের আবেশে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে চাঁদ ভেসে যায় তো আকাশে।

আধুনিক কবি, বস্তুতান্ত্রিক প্রগতিশীল কবি লিখলেন— আকাশে চাঁদ দেখে মনে হয় যেন একখণ্ড ভেনিলা আইস্‌ক্রীম। দেখেই খেতে ইচ্ছে করছে। কি আপদ, মনে করতেই দাঁত কন্‌কন্ করছে। যাই দাঁতের ডাক্তারের কাছে।

প্রগতিপন্থী আধুনিকারা কি বলবেন জানিনে। জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাইনে। তাঁরা হয়তো এই অমিতপরাক্রম কবির অতি উপাদেয় জঠর-পন্থী বর্ণনায় মুগ্ধ হবেন, আইস্-ক্রীমের স্বপ্নে তাঁদের মুখে হয়তো মধু-ক্ষরণ হবে। কিন্তু শুধু যে চাঁদ তাঁদের কবিকে দেখে ও তাঁদের দেখে পালাবে তা নয়। কলা-লক্ষ্মী পালাবেন, প্রত্যেক রস-পিপাসু পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবেন। এই কবির কল্পনা-লালার স্পর্শে সব কিছু সবুজ শুকিয়ে যাবে, মরে যাবে।

আজ এক দুর্লভ-স্রষ্টা, মহাকবির জন্মদিন। এই মহা-কবি তাঁর প্রাণ-দায়িনী সৃষ্টির দ্বারা বাঙলার, ভারতের ও বিশ্বের মানুষকে আত্মার অন্ন দিয়ে বাঁচিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি আমাদের প্রাণ-বায়ু, আমাদের চিত্তলোকের আলো, আমাদের রস তৃষ্ণার জল, আমাদের অন্তরের অমৃত অন্ন। আজ সেই মহা-কবির জন্মদিনে সৃষ্টির মূল কথাগুলিই আমাদের বুঝে নিতে হবে।

সৃষ্টির সেই মূল সূত্রগুলি হচ্ছে এই—

(১) উপকরণের বিচারে সৃষ্টির ভালমন্দ বিচার নয়, সৃষ্টির বিচার তার প্রকাশের উৎকর্ষতায় কিম্বা নিকৃষ্টতায়।

(২) বুদ্ধির বাহাদুরীর চশমা-পরা দৃষ্টি নয়, অনুরাগের, হৃদয়াবেগের রসের দৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির সহজ দৃষ্টি।

(৩) এই সহজ দৃষ্টির প্রাণ হচ্ছে বিস্ময় আর এই বিস্ময়ই হচ্ছে শিল্পের আনন্দ।

(৪) সৃষ্টির দৃষ্টি প্রয়োজনের দৃষ্টি নয়, রসের দৃষ্টি।

(৫) প্রয়োজনের ও কামনার দৃষ্টিতে বস্তুর রূপ ধরা পড়ে না। বস্তু বিকৃত হয়ে দেখা দেয়।

সৃষ্টির পথে নানা পরীক্ষা করতে করতে স্রষ্টা তবে সার্থক-সৃষ্টিতে পৌছন। এটা যেমন সব জাতের সৃষ্টি সম্বন্ধে খাটে, রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধেও তেমনি খাটে।

রবীন্দ্র-সংগীতের চারটি মহল আছে। প্রথম হচ্ছে খাঁটি রাগ সংগীতের মহল। এখানে গানের কথার অংশে, ভাবের অংশে, বিশেষত্ব ফোটালেন তিনি। অসামান্য কবিত্ব গানের কথার মধ্যে দেখা দিলো, গান যে শুধু সুর নয়, সে যে কথা ও সুরের বুনুনি, বাঙালী যে শুধু সুর শুনেই তৃপ্ত হয় না গানে, কথারও কদর অর্থাৎ ভাবের কদরও জানে, বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনের পরেও যদি তার প্রমাণ করবার দরকার থেকে থাকে তো সেটা রবীন্দ্রনাথ করলেন।

তারপরে তাঁর গান-সৃষ্টির দ্বিতীয় মহলে একটি গানকে একটি রাগে না বেঁধে, একটি শুদ্ধ রাগের কাঠামোর মধ্যে অন্য রাগের সুরকে স্থান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময় থেকেই তিনি জাত খোয়ালেন ওস্তাদদের আখড়ায়। ওস্তাদদের নাসিকা-কুঞ্চনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—"গানকে সরস্বতীর শিকল পরালে চলবে না। সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরী হোলেও নয়।" কিন্তু তাঁর গানের এই মহলও শুদ্ধ রাগরাগিণীর মহল।

রবীন্দ্র-সংগীতের তৃতীয় মহলে তিনি বাউল, ভাটিয়ালি, সারি,

কীর্তন প্রভৃতি সুরে তাঁর গানরচনা সুরু করলেন। এই মহলে যে গানগুলি বাসা বাঁধলো তারা খাঁটি লোক-সংগীতের সুরেই হোলো, কোথাও অল্প বিস্তর একটু ঠাটের বিশেষত্বের আমেজ অবশ্য তিনি দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের চতুর্থ মহলে লোক-সংগীত কিম্বা রাগ-সংগীত এ ছুটির কোনটাই তাল ঠুকে নিজের জাতের অভিমান জাহির করতে পারলো না। এ মহলে যে গানগুলির বাসা তারা একেবারে নতুন স্থষ্টি ভারতীয় সংগীতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে। ভারতীয় সংগীতের অন্যতম সুর-স্রষ্টা হিসেবে গণ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ এই মহলের গানগুলি স্থষ্টি করে।

এই স্থষ্টি যেমন সমাদর লাভ করেছে রসিক-মহলে তেমনি অবজ্ঞা পেয়েছে ওস্তাদ-মহলে। ভারতীয় সংগীতের শুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে এই অভিযোগ তাঁরা করেছেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মহাদেব, নারদ এবং ভরতমুনিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি, স্থষ্টি করতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।"

তিনি বলছেন—"মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে স্থষ্টি করে।"

আজকের সন্ধ্যের আসরে আমরা তাঁর গানের তৃতীয় ও চতুর্থ মহলের গানগুলি নিয়ে আলোচনা করে দেখবো।

যারা ছিলো প্রকৃতির বুকের কাছ ঘেঁসে তারাই স্থষ্টি করে প্রথম গান। প্রকৃতির রূপের বদল, তার রঙীন খেয়াল সব

দোলা দিয়েছে তাদের মনকে। অন্তরের সেই দোলা, রূপের ঝঙ্কার মনের অলখ তারে, তারা গান করে গেয়েছে। সেই সব প্রথম গানে সুরটা মুখ্য নয়, অন্তরের আবেগটাই মুখ্য। সেই সব প্রথম গানে কথাগুলোকে কোনরকমে সুরের বাঁধনে বেঁধেছে মানুষ। তাই মানুষের তৈরী প্রথম গানগুলোতে অর্থাৎ লোক-সংগীতে কথারই প্রাধান্য, সুরের নয়। যেমন পালা গান, তরজা, ঝুমুর, পাঁচালি, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি, সারি, বাউল প্রভৃতি লোক-সংগীতে কথাই সব জায়গা দখল করে আমাদের অন্তরের, সুর নয়।

কথা থেকে স্বতন্ত্র, সুরের যে নিজস্ব সত্তা নিজস্ব রূপ বলে একটা বস্তু আছে সেটা মানুষের মনে ধরা পড়লো অনেক পরে। তখন থেকেই রাগরাগিণী সৃষ্টির প্রয়াস সুরু হোলো, সৃষ্টি হতে লাগলো রাগরাগিণী। এবারে কিন্তু আর এক ধরণের বিপদ দেখা গেলো। রাগরাগিণীর যে নব ঠাট তৈরী হোলো সেই ঠাটগুলোকে সনাতন বলে, অপরিবর্তনীয় বলে জাহির করবার চেষ্টা চল্‌তে লাগলো। ঠাট-গোঁড়ামি, রীতি-সর্বস্বতা, বরকন্দাজি সুরু করলো সুরের লীলা-ক্ষেত্রে। রীতি হয়ে উঠ্‌লো সুরের কারাগার, রাগরাগিণীগুলো সুরের চলার পথ না হয়ে হোলো সুরের পায়ের শিকল। গান ক্রমশ রাজদরবারের গান হয়ে দাঁড়ালো। রাজদরবারের কুর্ণিশ, আদবকায়দার মতো দরবারী গানও কায়দার সাজ পড়লো। রাজদরবার যেমন প্রাণহীন, শুধু কায়দার বালির তৈরী মরুভূমি, দরবারী গানও হয়ে উঠলো তাই, শুধু কায়দার প্রাণহীন খেলা। প্রাণ সরে গেলো, সুরের রস গেলো শুকিয়ে—ঠাট-গোঁড়ামি, রীতি-সর্বস্বতা, sophistica-

tion একেই বলে। তখন দরবারী সংগীতের আড়ষ্টতা দূর করবার জন্যে, তার মর্মান্তিক আঁটবাঁধুনি আলগা করে সুরকে প্রাণবান করবার জন্যে সুরকারকে ধন্না দিতে হয়েছে লোক-সংগীতের দরজায়। প্রকৃতির বুক ঘেঁসে যারা আছে, মাটি-মায়ের আঁচল-ধরা সেই ছেলেদের কাছ থেকেই প্রাণের রস, সুরের রস আসে, ড্রইংরুম থেকে নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়— "প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে বড় শিল্পও টিঁকতে পারে না"। বাংলায় একটা যুগ এসেছিলো। তখন হঠাৎ বান এলো মরা গাঙে, শুকনো ডালে নব কিশলয়ের আবির্ভাব হোলো, বহুদিনের নি-ফুল গাছে ফুল ফুটে উঠলো। সেদিন আলোয় ভরে উঠলো জাতির অন্তর-আকাশ। সে কি আলো, সে কি জোয়ার, সে কি আকাশ-ছোঁওয়া ঢেউ বাঙালীর মনে! এতো রাজদরবারে গান শোনান নয়, এযে দেশের প্রতিটি লোককে শোনাতে হবে। চাষী যেখানে চাষ করছে, মাঝি যেখানে খেয়া দিচ্ছে, তাঁতী কাপড় বুনছে, জেলে মাছ ধরছে, সেখানে গান পৌঁছে দিতে হবে। দেশের কবিকে তাঁর কলা-লক্ষ্মীই তাগিদ দিলেন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের সেই উদ্বেলতাকে রূপ দিতে।

তখন দরবারী সুর বর্জন করে বাউল, সারি, কীর্তন, রাম-প্রসাদী প্রভৃতি অতি-পরিচিত গ্রাম্য সংগীতের সুরে গান বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, 'ও আমার দেশের মাটি' (বাউল), 'ছি ছি চোখের জলে' (বাউল ও কীর্তন মিশিয়ে তৈরী), 'যে তোরে পাগল বলে' (ঝুমুর সারির ঢঙে), 'বাংলার মাটি' (কীর্তন), 'এবার তোর মরা গাঙে' (সারি), 'আমার সোনার বাংলা'

(বাউল), 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ,' 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' (রামপ্রসাদী)।

স্বদেশী-যুগেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁর গানগুলিকে লোক-সংগীতের সুরে বসাতে সুরু করেন। আর এই সময় থেকেই তাঁর গান একটি স্বকীয়ত্ব লাভ করলো, মৌলিকত্ব লাভ করলো যেটা তাঁর আগেকার গানে ছিলো না। গানে নব সৃষ্টির সূচনা এখন থেকেই সুরু হোলো।

আশ্চর্য এই বাঙলা দেশ। এর আকাশে, বাতাসে, মাটিতে সৃষ্টির আগুনের হল্‌কা দিচ্ছে, সৃষ্টির বান আসছে যুগ যুগান্ত ধরে। এ মাটি সৃষ্টির তপস্যার আগুনে পুড়ে কালো হয়েছে। এর ইতিহাস শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টির ইতিহাস। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টির জোয়ার বইলো। সমস্ত ভারতবর্ষে যখন ন্যায় শাস্ত্রের প্রভাব বাঙালী তখন নব্য ন্যায় সৃষ্টি করেছে। বাঙলার কীর্তন, এটাও বাঙলার নিজস্ব সৃষ্টি—শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টি। ভগবানের নাম ও গুণগান ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই গাওয়া হয় যেমন পশ্চিমের ভজন-সংগীত কিম্বা তুকারমের অভঙ্গ। বাঙলার কীর্তন কিন্তু শুধু নাম-গুণ ও লীলার গান নয়। বাঙলার কীর্তনের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত বাঙলার কীর্তন একলার গান নয়, অনেকে মিলে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গান গাওয়া হচ্ছে বাঙলার কীর্তনের বিশেষত্ব। আর এর সূত্রপাত হয় চৈতন্যদেবের সময় থেকে। বৈষ্ণব পদাবলীর গানই বাঙলার প্রথম কীর্তন গান। পরে অবিশ্যি কালী-কীর্তন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত বাঙলার কীর্তন রাগরাগিনীর বাঁধন মানে নি। কীর্তনকে মার্গ সংগীতের কিম্বা দরবারী সংগীতের

কোঠায় ফেলা যায় না। কীর্তনের গানে কখনো একটি রাগ কিম্বা রাগিণী অনুসরণ করা হয় না। প্রথম দুটি পদে এক রাগিণী চলছে দ্বিতীয় দুটি পদে একেবারে অন্য রাগিণী সুরু হোলো। আখরের সুরে মূল রাগিণী থেকে সরে যাওয়া তো সাধারণ কথা।

চন্দ্রশেখরের একটি কীর্তন নিয়ে দেখা যাক :—

"কুঞ্জ সো নিকসই মানিনী রাই, অরুণিত লোচনে সখি মুখ চাই।"

এই পদটি বাঁধা হয়েছে ভীমপলশ্রী রাগিনীতে।

এই পদটির আখর হচ্ছে—"বেরলো রে মানিনী আমার আজ কুঞ্জ আঁধার দেখে, যেমন শরে-বেঁধা কুরঙ্গিনী আজ তেমনি মানে-বেঁধা রাই কমলিনী।" এই আখরে শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করা হোলো, কোমল ধৈবতও লাগলো যেটা ভীমপলশ্রীর নয়। আখরটি ভীমপলশ্রী রাগিনীতে নয়, পটদীপ রাগে। পরের দুটি লাইন হচ্ছে—

চলয়িতে পদ আধ চলয়ি না পারি
ছল ছল নয়নে বহয়ে ঘন বারি।

এই পদটির প্রথম লাইন—"চলয়িতে পদ আধ" প্রভৃতি—বড়হংস সারং সুরে, আর দ্বিতীয় লাইন—"ছলছল নয়নে বহয়ে —বিলাওল রাগে।

আখর—চল্‌বে কি সে, রাই ধনী আর চল্‌বে কি সে,
ওরে শ্যাম-সামর্থ হারায়েছে, রাই ধনী আর চল্‌বে কি সে।

প্রথম লাইনের আখর দেশ রাগে, দ্বিতীয় লাইনের আখর বিলাওলে।

এর থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে ও দরবারী সংগীতের রাগ রাগিনীর বাঁধন বাংলার কীর্তনকার ভেঙ্গে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয় দরবারী সংগীতে যে পদ্ধতিতে রাগ রাগিণী-গুলির গাওয়ার সময় বিচার করা হয়, কীর্তনে সে পদ্ধতি একেবারেই মানা হয় না।

কোন পালাটি কখন গাইতে হবে কীর্তনে সেটি নির্ধারিত হয়েছে রসের দিক থেকে লীলার সময়ের বিচার করে।

অর্থাৎ রসের বিচার একটি গান গাইবার সময় ঠিক করতে হয় কীর্তনে। যেমন রসের দিক থেকে বিচার করে কুঞ্জভঙ্গ ও খণ্ডিতা সকালে গাইতে হবে, রাত্তিরে নয়। রাত্তিরেই কুঞ্জভঙ্গ হলে চল্‌বে কেন, তাতে যে রসভঙ্গ হবে! খণ্ডিতাই বা হবে কি করে নারী—যামিনীর সব প্রত্যাশার সম্ভাবনা থাকতে? রাস দিনের বেলায় গাওয়া বারণ, গোষ্ঠ গাওয়া বারণ রাত্তিরে।

এই যে রসের বিচারে গানের সময় বিচার এটা কীর্তনে নিজস্ব। এটা বাঙলার সৃষ্টির মৌলিকত্ব।

তা ছাড়া রাঢ়ের অনেক প্রাচীন সুর কীর্তনে নেওয়া হয়েছে। যেমন বিপ্রদাস ঘোষের তৈরী রেণেটী সুর, রাঢ়ের লোকসংগীতের প্রচলিত সুর মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। এমনি করে লোক-সংগীতের বহু সুর কীর্তনে স্থান পেয়েছে।

বাংলার কীর্তনের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে আখর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কীর্তনের আখর কথার তান। দরবারী সংগীতে সুরের তান দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু কথার তান দেওয়ার রীতি আছে শুধু কীর্তনে।

বাঙলার নিজস্ব সৃষ্টি, রসের বিচারে সুরের বিচার—এই

অপূর্ব নীতির প্রমাণ যে কীর্তন তাকে রবীন্দ্রনাথ যিনি সুরের ছন্দের আড়ষ্টতা ভেঙ্গে গানকে কবিতাকে প্রাণময় করেছেন তিনি নেবেন না তো নেবে কে? তিনি অনেক গান কীর্তনের ঢঙে বাঁধলেন। তার মধ্যেও নতুনত্ব আনতে লাগলেন। আখর-সহ কীর্তন ও আখরহীন কীর্তনে দুই-ই রচনা করলেন।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই	(আখর-সহ কীর্তন)
ওহে জীবন-বল্লভ	"
সখি বহে গেল	(আখরহীন কীর্তন)
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	"
তবু মনে রেখো	"
আজি এ নিরালা কুঞ্জে	"
পুরানো জানিয়া চেও না	"
আমার না-বলা বাণীর	"

গান তো শুধু কথা নয় কিম্বা শুধু সুর নয়, গান হচ্ছে কথা ও সুরের পরিপূর্ণ মিলন। আমি আগেই বলেছি, লোক-সংগীতে কথারই প্রাধান্য বেশী, সুর এখানে শুধু কথাগুলোকে বেঁধে ধরবার ফ্রেম যেন। সুরের নিজস্ব রূপ ফুটে ওঠেনি লোক-সংগীতে। লোক-সংগীতের সুর বড়ো ফিকে, সুরের ঘন বুনুনি নেই। সুরের গ্রাম্যতা দোষ আছে যথেষ্ট।

বৈঠকী সংগীতে আবার সুরের রূপ ফোটাতে গিয়ে এমন রীতি-সর্বস্বতা দেখা দিয়েছে যে সুরের বাঁধুনি বাঁধন হয়ে গেছে। গানের কথা প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোক-সংগীতে সুর যেমন কথার রূপ ফোটাবার অবলম্বন, বৈঠকী সংগীতে কথাও তেমনি সুরের রূপ ফোটাবার সহায় মাত্র। সুর আবার আষ্টে-

পৃষ্টে বাঁধা! তার এদিক ওদিক নড়বার যো নেই। রাগরাগিণী যেন প্রাচীন কালে চীনদেশের মেয়েদের পায়ে জুতোর মতো। ঐ ছোট্ট বাঁধুনির মধ্যে সব ভাব ধরে দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ লোক-সংগীতের সুরের গ্রাম্যতা ও দরবারী সংগীতের সুরের আড়ষ্টতা ও রাতি সর্বস্বতা এই দুই-ই ঘোচাবার চেষ্টা করলেন। নানা উপায়ে সুরের সঙ্গে কথার ভাবের সার্থক মালা বদল করবার চেষ্টা করলেন রবীন্দ্রনাথ। এ চেষ্টা অতীতেও বারবার করছেন রসস্রষ্টা সুরকারেরা।

মার্গ-সংগীতের রাগরাগিণী অন্তত পাঁচটি স্বর দিয়ে রচিত। তিন বা চার স্বরে তৈরী সুর মার্গ সংগীতের কোটার বাইরে।

দণ্ডিল ঋষিরা রচনা "বৃহৎ দেশী" প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে তিনি লিখে গেছেন—"চতুঃস্বরের রাগ-রাগিণী মার্গ সংগীত নয়, এই ধরণের রাগরাগিণী শবর্ পুলিন্দ, বঙ্গ, কিরাত, বাহ্লীক অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি বন্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত।"

এই অনার্য জাতিরা আর্য সংগীতের ভাণ্ডারে অঢেল দান করেছেন।

অনার্য চার স্বরের বুনুনি কালিন্দী রাগিণী মার্গ সংগীতে স্থান পেয়েছে। চার স্বরে গাঁথা পুলিন্দী রাগিণীতে আর এক স্বর জুড়ে তাকে মার্গ সংগীতের জাতে তুলে নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীম শাস্ত্রকাররা এই প্রাক্-মার্গ সংগীতগুলিকে দেশী সংগীত আখ্যা দিয়েছেন। এই দেশী সংগীতগুলি সেই প্রাচীন যুগের লোক-সংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই দেশী সংগীত থেকে প্রচুর ভাবে গ্রহণ করেছে মার্গ সংগীত।

শাস্ত্রকার নারদ তাঁর 'সংগীত-মকরন্দ' গ্রন্থে গায়কের কি কি গুণ থাকা উচিত তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—মার্গং দেশং চ যো বেত্তি স গন্ধর্বোহভিধীয়তে।" যে ব্যক্তি মার্গ ও দেশী সংগীত জানে, সে গন্ধর্ব নামে পরিচিত।

'সংগীত-দর্পণ'-এর শাস্ত্রকার বল্‌ছেন—"মার্গ দেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্। স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতল-রঞ্জকম্"—"মার্গ আর দেশী এই দুই বিভাগের দ্বারা সংগীত দুই প্রকার বলে স্বীকৃত। মার্গ স্বর্গে আশ্রিত আর দেশী এই পৃথিবীর রঞ্জনকারক।" তাই দেশী সংগীতের কদর প্রাচীন কাল থেকেই চলে আস্‌ছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মূল রাগিণীর সঙ্গে লোক সংগীতের সুর মেশানোর পরীক্ষা করলেন, যেমন—

বকুলগন্ধে বন্যা এলো (আড়ানা বাহার ও কীর্তন), আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ (বাহার পঞ্চম ও কীর্তন), মরুবিজয়ের কেতন উড়াও (হাম্বীর, কেদারা ও কীর্তন), শীতের হাওয়ায় লাগালো নাচন (নট ও কীর্তন), এই গানগুলি সেই পরীক্ষার নিদর্শন দিচ্ছে।

তারপর মূল লোক-সংগীতের সুরে একটু রাগ-সংগীতের সুরের ছোঁওয়া দিয়ে সুরের গ্রাম্যতা দূর করলেন, সুরের গভীরতা ও ঐশ্বর্য বাড়ালেন। যেমন—

বাউল আর কীর্তন-এর সুরের সঙ্গে পূরবী মেশানো 'এ বেলা ডাক পড়েছে' গানটি। বাউলের সুরের সঙ্গে ইমন মিশিয়ে তৈরী 'একহাতে ওর কৃপাণ আছে' গানটি। বাউলের সঙ্গে রাগ-সংগীতের সুর মেশানো 'তুমি বাহির থেকে' গানটি

আর বাউলের সঙ্গে কালেংড়া, আশাবরী ও বাহার মেশানো 'আমারে ডাক দিলে' গানটি।

এতোদিন দরবারী সংগীতের সুরের উপর লোক-সঙ্গীতের সুরের মীনের কাজ আর লোক-সংগীতের সুরের উপর বৈঠকী সংগীতের রাগ রাগিণীর মীনের কাজ—এরই পরীক্ষা চলছিলো। এবারে রবীন্দ্রনাথ লোক-সংগীত ও রাগ-সংগীত সমান ভাবে মিশিয়ে গান রচনা সুরু করলেন।

যেমন কালেংড়ার সঙ্গে বাউল মেশানো 'কান্না হাসির দোল দোলানো' গানটি, ভৈরবীর সঙ্গে বাউল মিশিয়ে তৈরী হোলো 'আমায় ভুলতে দিতে', কালেংড়ার সঙ্গে বাউল মিশিয়ে হোলো 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই', এরকম আরো অনেক গান।

লোক-সংগীতে বিশেষ করে বাউল গানে পিলু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বিভাস, ভূপালী, দেশকার—এই সুরগুলোর ব্যবহার করা হয়। ঢঙটির আর তালের এমন একটা নিজস্ব কায়দা আছে যা শুনলেই মনে হয় যে এটা লোক-সংগীত। শুধু তাই নয়, এক একটি অঞ্চলের প্রকৃতির বিশেষ রূপ সুরের উপর তার রেখা বুলিয়ে দেয়। যেমন পশ্চিম বাংলার বাউলের গান।

পশ্চিম বাংলায় কূল-হারা নদী নেই, এখানে ছোট তরতরে নদী, হঠাৎ বান-ডাকা নদী, গেরুয়া পাগলামি তার। পশ্চিম বাংলার বাউল গান তাই পিলু, খাম্বাজ, বারোয়া প্রভৃতি রাগে তৈরী। তাল তার দ্রুত, যেমন 'আমি তারেই জানি' (পিলু), 'ওরে ওরে ওরে আমার' (পিলু, বারোয়ার ছোঁওয়া), 'আমার

প্রাণের মানুষ' (পিলু ও খাম্বাজ মিশনো) 'ও আমার মন যখন' (পিলু) গানগুলি।

আর পূর্ব বাংলার বাউল গান ?

পূর্ব বাংলার নদী, বিরাট বিস্তৃতি তার, ধারা তার একটানা অবিরাম। সেই বিরাটত্বের সঙ্গে, একটানা তার স্রোতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার বাউলের গানও দ্রুত তালের নয়, একটু ঢিমে চালের ভঙ্গী তার। দেশকার, বিভাস, ভূপালী, ঝিঁঝিট প্রভৃতি রাগে তারা রচিত।

যেমন ঝিঁঝিটে 'ও নিঠুর আরো কি বাণ', পাহাড়ী কিংবা জংলা সুরে 'বসন্তে কি শুধুই কেবল', বিভাস ও বেলাবলী মিশ্রিত 'তোমার খোলা হাওয়ায়', ঝিঁঝিট খাম্বাজে 'তোর শিকল আমায়', ঝিঁঝিটে 'আমার সোনার বাংলা', ভূপালিতে 'নিশি দিন ভরসা রাখিস', দেশকারে 'আমি ভয় করবো না'। বিভাসে 'আজ ধানের ক্ষেতে'।

আর এক ধরণের সুরের পরীক্ষাও তিনি করেছেন। রাগ-সংগীতের সুর সম্পূর্ণ বজায় রেখে শুধু তালের বৈচিত্র্যে লোক-সংগীতের ঢঙ এনেছেন গানে। যেমন তিলক, কামোদ ও দেশ এই তিন রাগের বুনুনি 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' গানটিকে প্রথম অক্ষরে ঝোঁক-দেওয়া ঝুমুরের তালে বেঁধে লোক-সংগীতের ঢঙ এনেছেন। খাম্বাজ রাগের 'বাদল বাউল বাজায়রে একতারা' গানটিকে সারির চারমাত্রার কার্‌ফা তালে বেঁধেছেন। ঝুমুর তালে বেঁধেছেন ভৈরবী রাগিণীর সুরে রচা 'আয়রে মোরা ফসল কাটি' গানটি। বাউল গানের তিন মাত্রার ও আড়েতে ঝোঁকে-দেওয়া দ্রুত তালের ছন্দে ফুটিয়েছেন পিলু ও খাম্বাজে গাঁথা 'নদী আপন বেগে'

গানটি। বাউলের ত্রৈমাত্রিক দ্রুত ছন্দে বেঁধেছেন কালেংড়া রাগের "'ঘরেতে ভ্রমর এলো' আর ভৈরবী রাগিণীর 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' গান দুটি।

এমনি করে সুর-সৃষ্টির বিচিত্র পরীক্ষা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভাবের প্রকাশের জন্যে রাগ-রাগিণীর বাঁধা ঠাট ভেঙ্গেছেন তিনি, কখনো লোক-সংগীতের সুর মিশিয়ে, কখনো এক রাগের সঙ্গে অন্য রাগ মিশিয়ে, কখনো রাগ-সংগীতে লোক-সংগীতের ঢঙ প্রবর্তন করে, কখনো লোক-সংগীতের সুরে রাগ-সংগীতের সুর মিশিয়ে, কখনো বা শুধু তালের হেরফের করে সুরের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুলে।

প্রকৃতির মহলে যেমন রঙ মেশানোর শেষ নেই, অফুরন্ত চলেছে রঙ মেশানোর লীলা প্রকৃতির রঙমহলে, তেমনি সুরকার রবীন্দ্রনাথের সুর মেশানোর শেষ নেই। তাঁর অন্তরের সুরের রঙ গোলার বাটিতে নানা রঙের সুর মেশানোর কাজ থামেনি কখনো। স্রষ্টার অন্তরে এই মিশ্রণের ক্রিয়া চলেই। আজ বাংলার প্রাণের সরোবরে রসের কমল ফুটেছে না। আজ বড়ো দুর্দিন বাংলার। কিন্তু সৃষ্টির জোয়ার আসবেই একদিন আমাদের মরা গাঙ্গে। সে দিনের জন্যে আমাদের অন্তরের মধ্যে সব আয়োজন সুরু করতে হবে এখন থেকে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে গান হচ্ছে রস-সৃষ্টি। টেকনিক দেখানো গানের উদ্দেশ্য নয়, রস-সৃষ্টি গানের উদ্দেশ্য।

টেকনিক আয়ত্ত করবার খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে টেকনিকের বাহাদুরী দেখাবার জন্যে গান গাওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে

আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়।" গানে কথার ফুল-গুলি সুরের অলখ সুতো দিয়ে বোনবার জন্যে টেকনিক। যেমন শরীরের লাবণ্যের আধার হচ্ছে শরীরের কঙ্কালের ফ্রেম, ঠিক তেমনি গানের রসের আধার হচ্ছে টেকনিক। কঙ্কালের উপর দিয়ে যদি চামড়ার ঘেরাটোপ না পড়তো, লাবণ্যের জোয়ার যদি না বইতো তা হোলে যেমন হোতো, সুরের টেকনিকের উপর দিয়ে রস-স্রোত না বইলে ঠিক তাই হয়।

রস-সৃষ্টির সহায়ক হিসেবেই টেকনিকের দাম আর টেকনিক আয়ত্ত করা একান্ত দরকার নইলে রস ও রূপ পাবে না সুর। বিশেষ করে বাংলা দেশে টেকনিক আয়ত্ত করার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া দরকার, কেন না বাঙালী ভাবের উপর, প্রেরণার উপর, রসের উপর ঝোঁক দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশের টেকনিক শেখবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়। তার ফলে ভাবের বদলে ভাবালুতা, রসের জায়গায় উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়। টেকনিকের কসরৎ দেখিয়ে গানের রস-মেধ যজ্ঞ চলে কালোয়াতি মহলে আর রস-সৃষ্টির নাম করে শ্লথ রূপ-হীন, রসের কাদা খেলা চলে টেকনিক-জ্ঞানহীন আধুনিকদের মহলে। এ দুই-ই বর্জনীয়। রবীন্দ্রনাথ সুরের তালের সব টেকনিক, সব রীতি জেনে তবে তাকে অতিক্রম করেছিলেন। তবেই রস-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিলো।

রস সৃষ্টির নিয়ম আমাদের মনে রেখে চল্‌তে হবে। রস খানিকটা উচ্ছ্বাস নয়, ভঙ্গীও নয়, রস প্রাণের গভীর অনুভূতির প্রকাশ। সৃষ্টিতে গানেতে রসের যে লাবণ্য আসে সেটা স্রষ্টার, সুরকারের অনুভূতির রঙ, তার লাবণ্য। ওতে কৃত্রিমতা থাকতেই

পারে না কেননা ওটা প্রাণের সহজ রঙে রাঙা। এই রস-সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টির-রীতি, টেকনিক জানতে হবে ও আয়ত্ত করতে হবে, আবার তাকে ছাপিয়েও যেতে হবে। টেকনিককে ঢেকে দিতে হবে রসের রঙীন আবরণে ঠিক যেমন করে বাড়ীর ইঁটের কঙ্কাল ঢেকে দিতে হয় বালি দিয়ে চুন দিয়ে রঙ দিয়ে, ঠিক যেমন করে প্রকৃতি মানুষের দেহের হাড়ের কাঠামোটিকে মাংসের পলি দিয়ে রঙের লাবণ্য দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তবেই রস-সৃষ্টি সার্থক হবে। গানের উদ্দেশ্য যে রস-সৃষ্টি আর কিছুই নয়, এটা মনে রাখতেই হবে।

আমাদের এই সন্ধ্যের আসর আজ শেষ হবে লোক-সংগীত ও রূপ-সংগীত মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অসংখ্য গান সৃষ্টি করেছেন তার থেকে কয়েকটি গান গেয়ে। গানেই শেষ হবে তাঁর জন্মোৎ-সব যিনি ছিলেন গানের উৎস। গান সুরু হবার আগে যে গান-গুলি গাওয়া হবে তাদের একটু পরিচয় দিয়ে দেবো আর গান সম্বন্ধেও দু চারটি কথা বললো।

এখন শুনবো আমরা বাউলের সঙ্গে কালেংড়ার আমেজ মাখানো 'করে তুমি অসাবে বলে রইবো না বসে' গানটি, শুনবো কীর্তন ভাঙা 'দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হোলো', কীর্তন ও বাউলে মেশানো 'স্বপন পারের ডাক শুনেছি', খাম্বাজের সঙ্গে কীর্তন মিশিয়ে রচিত ও ঝাঁপতালের ৩।২ মাত্রাকে ২।৩ মাত্রায় সাজিয়ে সেই ছন্দে বাঁধা 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে', আর পিলুর সঙ্গে কীর্তন মিশিয়ে তৈরী 'তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে' গানটি।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের গানের জগতের একজন অসাধারণ স্রষ্টা।

তিনি ভারতবর্ষের সুর সৃষ্টির ধারাকে অস্বীকার তো করেনই নি, তিনি তাঁর প্রকৃত রসটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন ও যখন সেই রস রীতি-গোঁড়ামীর বাঁধনে মরে যেতে বসেছে, তখন তাকে নতুন পথে চালিত করে বাঁচিয়েছেন।

সংস্কারকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি নেই, আবার সংস্কারসর্ব্বস্ব হলেও সৃষ্টির ধারা রীতির মরুভূমিতে গিয়ে মরে যায়।

রবীন্দ্রনাথ গানকে দরবারী সংগীতের তানের মর্মান্তিক প্রাণ-হীন প্রলাপের ও তালের তাণ্ডব থেকে বাঁচিয়েছেন।

তিনি ভাবকে মেনেছেন গানের উপকরণ হিসেবে, সুরকেও লঘু করেননি, তার ভদ্রতা ও শালীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

তিনি ভারতীয় সংগীতের নৈর্ব্যক্তিকতাকে ব্যক্তির অনুভূতির প্রকাশের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী করেছেন। তিনি ভারতীয় সংগীত-কে মানব-ধর্মী ও ব্যক্তি-ধর্মী করেছেন।

তিন কথার সঙ্গে সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন অথচ কথাকে যেতে দেননি সুরকে ছাপিয়ে।

সংগীতের এলাকায় যাঁরা সৃষ্টির সাধনা করেছেন তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি মনে রাখেন—"গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগবিলাস হয় তবে তাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হবে। কেন না যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ।...তাহোলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড়ো হবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড়ো হবে।"

বর্ষণ

শুষ্ক-জল নদী, তৃষাদার্ণ মাঠ, রৌদ্র-দগ্ধ গৈরিক দিগন্ত। কতো দিনের কতো দাহ, কতো শুষ্কতা! মাঠ তৃষার্ত, বন তৃষার্ত, মাটি তৃষার্ত, পশু পাখি মানুষ সবাই তৃষার্ত। ধরণী তপোরতা উমার মতো শীর্ণা। পৃথিবী রৌদ্রদাহে পাণ্ডুর। সব আবিলতা, সব জঞ্জাল পুড়ে শেষ হোয়ে গেলো। এখন নামলো ধারা। দহন ছাড়া কি রস আসে? রৌদ্রদাহের পর এলো ধারা। রোদে-পোড়া মাটির বুক ভেদ কোরে এলো জল। যে জল লুকিয়ে ছিলো মাটির বুকে, সে জল রৌদ্রতাপে মাটির বন্ধনমুক্ত হোয়ে গেলো আকাশে, আবার ফিরে এলো বৃষ্টিধারায় মাটির বুকে। কাছের যে তাকে এমনি কোরো দূরে যেতে হয় আবার সত্যি কোরে কাছে ফিরে আসবার জন্যে। সেই শুষ্কতার, তৃষাদীর্ণ আকুলতার অবসান আনে বর্ষণ, আনে নূতনের আভাস, পূর্ণতার ইঙ্গিত। তাই বর্ষার উৎসব। সব উৎসবই পূর্ণতার ইঙ্গিত দেয়, পরিবর্তনের আগমনী গান গায়। প্রাচীন কাল থেকে বর্ষার উৎসব চলে আস্‌ছে আমাদের দেশে। বর্ষাকে বন্দনা কোরেছেন আমাদের দেশের কবিরা যুগে যুগে।

ঋগ্বেদের সপ্তম্ মণ্ডলে আচে এই সূক্ত :—

পর্জন্যায় প্রগয়েত, দিবস্পুত্রায় মীঢ়ষে। স নো যবসমিচ্ছতু। অন্তরীক্ষের পুত্র যে মেঘ, রসবর্ষণকারী যে মেঘ তার উদ্দেশ্যে গান করো। তিনি তুষ্ট হয়ে আমাদের অন্নদান করুন।

একটি সূক্তে ঋষি বলছেন ঃ—

সরোবর শুকিয়ে গিয়েছিলো, এখন জলে পূর্ণ হয়েছে। তাই অন্য সব প্রাণীর মতো দাদুরীও ধ্বনি করছে আনন্দে।

সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে ঋষি-কবি বলছেন ঃ—

"বর্ষার প্রারম্ভে মণ্ডুকরা সবাই একরকম ধ্বনি করছে।" এই অনুরূপ ধ্বনির উপমা দিয়ে ঋষি বলছেন—"অধ্যাপক ছাত্রকে যখন বেদ পড়ান (বদতি শিক্ষমান ঃ) তখন উপযুক্ত ছাত্র যেমন গুরুর কথার প্রতিধ্বনি করে, তেন্নি এক মণ্ডুকের ধ্বনি অন্য মণ্ডুক নকল করে ডাকছে।

রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি বর্ষার বর্ণনা করেছেন ঃ—

মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোঽপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ॥

পর্বত মেঘের কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করেছে, মেঘের শুভ্রধারা হচ্ছে পর্বতের যজ্ঞোপবীত। পর্বতগুহায় বাতাস প্রবেশ করে ধ্বনি করছে। মনে হচ্ছে মেঘ যেন আজ বেদপাঠ করছে।

বলছেন মহাকবি ঃ—

বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ প্রিয়াবিহীনা শিখিনঃ প্লবঙ্গঃ॥

নদী বইছে, মেঘ বর্ষণরত, মত্তগজ নাদ করছে, বনপ্রান্ত অপরূপ শোভা ধারণ করেছে, বিরহীরা ধ্যান করছে প্রিয়ার, ময়ূরেরা নৃত্যরত, কপিরা বরিষণে আশ্বস্ত। (ভট্টিকাব্যে ভট্টি বর্ষার এই শ্লোকটি বেমালুম নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন)।

বলছেন বাল্মীকি ঃ—

কদম্বসর্জার্জুনকন্দলাঢ্যা বনান্তভূমির্মধুবারিপূর্ণা।
ময়ূরমত্তাভিরুতপ্রনৃত্তে রামানভূমিপ্রতিমাবিভাতি॥

কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কন্দলী দ্বারা সমৃদ্ধা বনভূমি বৃষ্টির মধুরবারিতে পূর্ণা। ময়ূর মত্ত হয়ে কেকাধ্বনি করছে ও নৃত্য করছে। বনভূমি আজ আপানভূমির ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং প্লবঙ্গমোদীরিত কণ্ঠতালম্।
আবিস্কৃতম্ মেঘমৃদঙ্গনাদৈবনেষু সঙ্গীতমিবপ্রবৃত্তম্॥

অলিরা গুঞ্জনের দ্বারা তন্ত্রীধ্বনি করছে, বানরেরা আনন্দে কণ্ঠধ্বনি করছে, মেঘদল মৃদঙ্গধ্বনি করছে। সমস্ত বন যেন সংগীতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি প্রবান্তিবাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রণষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রম্ নদ্যোজলম্ বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ।

প্রবল বেগে বর্ষার বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ছে, বাতাস বইছে প্রবল বেগে। নদী কূল ডুবিয়ে পথ হারিয়ে মত্ত উল্লাসে বয়ে চলেছে।

মহাকবি কালিদাস তাঁর ঋতুসংহারে বর্ষার অপরূপ রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রিয়ে দেখো বর্ষা ঋতু আসছে, রাজার মতো তার দ্যুতি, জলভরা মেঘ হোলো এই রাজার মত্ত হস্তী, বিদ্যুৎ তার পতাকা, বজ্রের নির্ঘোষ হোলো মাদলের জয়ধ্বনি। আকাশে মেঘ টলমলো, কোন মেঘ নীলোৎপলের মতো নীল, কাজলের মতো কালো কোন মেঘ। চাতক তৃষিত। মেঘের দল মাদল বাজাচ্ছে, তার ধ্বনি শোনো বজ্রের আওয়াজে,

ময়ূরীদল কলাপ বিস্তার কোরে কেকাধ্বনি কোরছে। বর্ষার জলে তটিনীগুলি আবিলা, অভিসারিকার মতো অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছে তারা সিন্ধুপানে। হরিণরা ভয়ে সচকিত। অভিসারিকারা বিদ্যুতের আলোতে পথ চল্‌ছে। নব-বর্ষার জল সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। দাদুরী সর্প-গতি জলধারা দেখে ভীত ও চকিত। শাল, কদম্ব, অর্জ্জুন ও কেতকী বর্ষার ধারায় কম্পিত ও সজল। আজ মেঘদল বিরহিণীদের মন চুরি কোরছে। বধূরা বনফুল যুঁথীমালতীর মালা পরেছে কালো কেশে, কর্ণে তাদের নবকদম্বের আভরণ। বনানীর তপজ্বালা আজ বৃষ্টি-ধারায় প্রশমিত। বনানীর দেহে রোমাঞ্চসম ফুটেছে আজ কদম ফুল।" চমৎকার বর্ণনা প্রকৃতির কিন্তু এ বর্ণনার একান্ত ভাবে বারমহলের বর্ণনা। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নারী-দেহ কবিকে এমন দিশেহারা করে দিয়েছে যে কবির সৌন্দর্য-বোধ রসের সংযম হারিয়ে একেবারে উশৃঙ্খল। স্থূলতার ফেনায় কবি আচ্ছন্ন কোরেছেন তাঁর মানস-সুন্দরীকে। সৌন্দর্যের গভীর, প্রশান্ত, বেদনা-মাখানো অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরতে পারেন নি কালিদাস 'ঋতুসংহারে'। বারমহলের কাব্য 'ঋতুসংহার'। 'মেঘদূতে' সুর বদল হোয়েছে, রসের সংযম এসেছে, তবুও 'মেঘদূতের' বর্ষা বাইরের বর্ষা থেকে গেছে, অন্তরে বর্ষা নামাতে পারেন নি মহাকবি।

বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় বর্ষা মানবীয় রসে নিটোল হোয়ে উঠলো। স্থূলতা, রসের আবিলতা বৈষ্ণব কবিতায় যথেষ্ট আছে কিন্তু রসের শুচিতা, অন্তর্মুখিনতার নিদর্শনও কিছু কবিতায় আছে। বর্ষার বর্ণনা কোরে বিদ্যাপতি বোল্‌ছেন—

'বারিস যামিনী, কোমল কামিনী, নিদারুণ অতি অন্ধকার।
পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর, ঘনপর জলধার।'

বর্ষারাত্রি, কামিনী কোমলা, ঘন অন্ধকার। পথে নিশাচর, অবিরল ঘন জলধারা, কেমন কোরে যায় সে অভিসারে ?

একটি কবিতায় বোল্‌ছেন বিদ্যাপতি—গগনে গম্ভীর গর্জন, মন তার ভ্রূক্ষেপই করে না। বজ্রপাতে ভীত হোয়ে মন মুখ ঘোরায় না। শুধু ভয় যে বৃষ্টির ধারা রাত্রির অন্ধকার ও নয়নের কাজলের মতো অন্ধকারকে ধুয়ে না দেয়। অভিসারে যেতে হবে তো।

বোল্‌ছেন বিদ্যাপতি—রাত্রি আজ কাজল পরলো। ঘন মেঘ বারি-বর্ষণ-রত। আজ অভিসারে যাওয়ার বড়ো কষ্ট। যমুনায় আজ ভয়ঙ্কর ঢেউ। অনুরাগের বেগে যদি জলে নামো, তীর পাবে না। ঢেউ আজ বিদ্যুৎকে ভয় দেখাচ্ছে। 'বিজুরী তরঙ্গ ডরাই'।

বোলছেন কবি—ময়ূরের কেকা আমার বিরহ-বেদনা বাড়াচ্ছে। এলো প্রথম আষাঢ়, গগনে গভীর গর্জন। বৃষ্টি ঝরছে তীক্ষ্ণ ধারায়, মনে হোচ্ছে যেন মদনের তীর এসে বিঁধছে। বিরহিণী বাঁচে কি কোরে ?

বাদল আর অভিসার থেকে কবিতা ক্রমশই মনের গহনে এগিয়ে গেলো। বিরহ শুধু দেহান্তক রইলো না।

বোল্‌লেন কবি—ধরণীর বুক আজ দীর্ণ। মেঘ ঘন গর্জনে বর্ষণ কোরছে। প্রিয় আজ বিদেশে, তার আসবার সময় গত। বর্ষার রাত, হায়রে, আমার মন্দির আজ শূন্য।

কি কোরবো আমি একা! ক্ষীণ তটিনী আজ বিপুলা, জল আজ গভীর, কেমন ক'রে আস্‌বে আমার পথিক ?

বোল্‌ছেন—আকাশে নিবিড় মেঘ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, বজ্রপাতের শব্দ হোচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে সজোরে ঝাপটা। এতো বিঘ্ন চারদিকে, তবুও এ বিঘ্নকে আমি কি ডরাই ? আমার মন প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় অভিসারে বের হোয়েছে। বিচারের কি আছে, তার ভয়েরই বা কি আছে ?

বোল্‌ছেন—সখি হে হমর দুখক নহি ওর।

সখি, আমার দুঃখের অন্ত নেই। আজ ভরা বাদর, আমার মন্দির শূন্য। মেঘ গর্জন কোরে সারা ভুবন ব্যেপে বর্ষণরত। প্রিয়তম প্রবাসে, আমি গভীর বিরহ-কাতর। বিদীর্ণ হোচ্ছে আমার বুক। দশদিক ভরে আজ ঘন অন্ধকার। অস্থির বিজুলী ছোটাছুটি কোরছে। এমন দিন রাত কাটাবো কেমন কোরে ?

বাইরের জগতের বর্ষা বুকের পাঁজরে আঘাত হান্‌তে হান্‌তে অন্তরে পৌঁছে গেলো।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়
বিরহীণী বেদন বাঢ়। (বিদ্যাপতি)

আষাঢ় অন্তরে এলো, বিরহিণীর বেদনা গেলো বেড়ে।

বর্ষাকে অন্তরের গহনে বইয়ে দিলেন কবি। বর্ষা শুধু বাইরের প্রকৃতির বর্ষা হোয়ে থেকে গেলো না, মানুষের অন্তরলোকেও নামলো এসে বর্ষণ। কবি ধন্য হোলেন।

৭

ভারতচন্দ্রও বর্ষার বর্ণনা কোচ্ছেন চৌপদীতে—

বর্ষা-বর্ণনা

ভুবনে করিল তুর্ণ নদ-নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল কর্ষা।
ময়ুর ময়ুরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখ-মূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্ব ফুল আ আরে বর্ষা ॥

এই কবিতায় ছন্দের কারিকুরি আছে, বিরহের উল্লেখও আছে কিন্তু এ বিরহ কামানল ধক্‌ধকির নামান্তর, একান্তভাবে দেহসম্বল বিরহ। এই চৌপদীর ছন্দের বাহাদুরীর তারিফ করা যেতে পারে কিন্তু এই ভাববিহীন ছন্দোবদ্ধতা হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চীন দেশে বারোশো খৃষ্টাব্দে লু ইউ নামে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন। বৃষ্টির উপর তাঁর দুটি চমৎকার কবিতা আছে। একটি হোচ্ছে 'বৃষ্টির হাওয়া'।

বৃষ্টির হাওয়া

পাহাড়ের চূড়োকে অবগুণ্ঠনে ঢেকে দিচ্ছে বৃষ্টির হাওয়া। নদীর গর্জনে কুটিরগুলি কাঁপছে। মেঘে মেঘে আকাশ কালির মতো কালো। ঢেউগুলোকে ফুলের মতো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বৃষ্টির হাওরা।

অন্য কবিতাটি হোচ্ছে—

বসন্তের বৃষ্টি

বসন্তের বিষাদ থেকে মুক্তি নেই। কখন থাম্‌বে বসন্তের বৃষ্টি ?

মাসগুলো কালো, ধূসর ও বেদনাভরা। টিপ্‌ টিপ্‌ কোরে বৃষ্টি পড়ছে ভোর পর্যন্ত। অন্ধকার বাতায়ন। বীণায় তারগুলো বাজছে ধীরে ধীরে। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে ঢাল্‌ছি নতুন সুরা।

অন্তর্লীনতা আছে এই দুইটি কবিতায়। দরদী কবি বৃষ্টিকে বুকের মধ্যে পাঁজরের তলায় টেনে নিয়েছেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বর্ষার আদর নেই, বরফের আদর আছে। শরতের বৃষ্টি, শীতের শেষে বসন্তের প্রথম বৃষ্টি ইউরোপীয়দের কাছে সমাদর পায় নি। বৃষ্টির উপর কবিতা ইউরোপীয় সাহিত্যে নেই বল্‌লেই চলে। তবুও দু'তিনটি কবিতা যা সংগ্রহ কোরতে পেরেছি তা'র থেকে ইয়োরোপের কবিরা বৃষ্টিকে কি ভাবে দেখেছেন তা'র পরিচয় পাওয়া যাবে।

বৃষ্টির উপর শেলীর একটি ছোট্ট চার লাইনের কবিতা আছে, আর আছে বৃষ্টির উপর তাঁর একটি লাইন।

লাইনটি হোচ্ছে—বাতাসে ছিলো বৃষ্টির মাধুরিমা।

চার লাইনের কবিতাটির নাম 'বৃষ্টি'।

আপনার জল-ভারে বেদনায় মন্থর কনকনে বাতাস যখন এই ধূসর আলোহীন আবহাওয়ার মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় তখন নামে বৃষ্টির খামখেয়ালী ধারা।

আমেরিকার কবি হুইটম্যানের একটি কবিতা আছে বৃষ্টির উপর। কবিতাটির নাম 'বৃষ্টির ভাষা'।

বৃষ্টির ভাষা

'শুধালুম আমি ঝির্ঝির্ কোরে ঝরে-পড়া বৃষ্টির পশ্লাকে —কে তুমি, তুমি কে? কি উত্তর দিলো বৃষ্টি, শোনো :—

বোল্লো বৃষ্টি—এই ধরণীর কবিতা আমি। অতল সমুদ্র আর ভূমি হোতে আমার জন্ম। অলখরূপে আমি নিরন্তর ধেয়ে চলি আকাশের দিকে।

আকাশে আমি আবছায়া রূপ নিই, একেবারে বদল করি নিজেকে, তবুও আমি আগে যা ছিলুম তাই থাকি। আমি আসি অনাবৃষ্টি, রেণুপরমাণু, পৃথিবীর ধূলিস্তরগুলিকে ধুয়ে দিতে। আর এদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে বীজরূপে আমার বিহনে; অজাত, সুপ্ত সেই সবকে সিক্ত কোরতে আমি নেমে আসি।

আমার উৎপত্তিতে, যাদের থেকে আমি জন্মলাভ কোরেছি সেই সমুদ্র আর ভূমিকে চিরকাল দিন রাতে ফিরিয়ে দিই আমি প্রাণ, করি নির্মল, করি সুন্দর।'

ইটালীর কবি ডান্নুন্ত্সিও একটি অপূর্ব কবিতা লিখেছেন বৃষ্টির উপর। কবিতাটি হোচ্ছে 'বৃষ্টি পাইনের বনে'।

বৃষ্টি পাইনের বনে

'আজ বনানীর প্রান্তরদেশে, শুনিতে না পাই কোনো কানাকানি মানবের স্বরে। শুনি শুধু দূরে কোন কথা বৃষ্টি ফোঁটা পল্লবেতে বলাবলি করে! শোনো, বৃষ্টি ঝরে খণ্ড মেঘ

হোতে। কণ্টকিত পাইনের ’পরে বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে। মঞ্জরিত জিনেষ্ট্রোর পরে বৃষ্টি এসে নামে। বৃষ্টি ঝরে ঝরঝর মুখে আমাদের, বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত আমাদের হাতে। বৃষ্টি পড়ে ফুরফুরে বসনের ’পরে। বৃষ্টি ঝরে ঘুণে-ধরা মনের চিন্তায়। বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে, যে কণ্ঠের স্বরে কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি ভুলেছি ছলনে, অয়ি এরমিওনে। শুনিতে কি পাও? বৃষ্টি ঝরে সঙ্গীহীন তৃণপরে। শোনো, বৃষ্টির কান্নার উত্তর দিতেছে আজ সংগীত ঝিল্লীর। পাইনের তরু এক সুরে গান গায়, অন্য সুরে গাইছে মির্‌টো। জিনেপ্রোও গেয়ে চলে আপনার সুরে। নানা যন্ত্র যেন বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে। মোরা দোঁহে ডুবে গেছি বনানীর প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে। তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে হোয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল পল্লবের মতো। তব কেশ ঝলসিছে আলোকিত জিনেষ্ট্রার মতো। শোনো, শোনো, বাতাস-ঝিল্লীর গান মূক হোয়ে আসে বর্ষণের বেড়ে-চলা ক্রন্দনের তলে। শুধু এক সুরে কেঁপে ওঠে, নিবে যায়, জ্বলে ওঠে, কেঁপে মরে, শেষে যায় নিবে। সিন্ধু-ধ্বনি শোনা নাহি যায়। শুধু শুনি পল্লবের পরে বৃষ্টি ’পড়ে ঝরে। বৃষ্টি সে রূপালি, বৃষ্টি সে নির্ম্মল। শোনো, সুদূরের জলার নন্দিনী দাদুরী সে গায় ঘন ছায়াতল হোতে। সে কোথায়? সে কোথায়? নয়ন-পল্লবে তব নামে বরিষণ, অয়ি এরমিওনে। বৃষ্টি পড়ে তব কালো আঁখিপত্রপরে, যেন তুমি কাঁদিতেছো সুখভরে, শুভ্র অশ্রু নয়। যেন প্রায় কালো অশ্রুরূপে বাহিরিয়া আসিয়াছ তব দেহ হতে। বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরে

মুখে আমাদের। বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত আমাদের হাতে। বৃষ্টি পড়ে ফুর্‌ফুরে বসনের পরে। বৃষ্টি পড়ে ঘুণে-ধরা মনের চিন্তাতে। বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে, যে কণ্ঠের স্বরে কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি ভুলেছি ছলনে, অয়ি এরমিওনে।'

শুধু পাইনের বনে এ বৃষ্টি নামে নি, এ বৃষ্টি শুধু নেমেছে ঘুণে ধরা মনের চিন্তাতে, কণ্ঠের ধ্বনিতে। এ বৃষ্টি শুধু পাইন জিনেষ্ট্রো আর মিরটোকে সিক্ত করেনি, এ বৃষ্টি আমাদের মুখ সিক্ত কোরেছে, মনের চিন্তাকে সিক্ত কোরেছে, এরমিওনের কেশকে সিক্ত কোরেছে, এরমিওনের মুখ মাতাল হোয়েছে এই বৃষ্টি-ধারা পান কোরে।

এলেন এক কবি এই বাঙলাদেশে, জানি না কি মন্ত্রে তিনি প্রকৃতির মন ভোলালেন। সরিয়ে নিলো প্রকৃতি তার মুখের অবগুণ্ঠন, বুকের আঁচল। জেনে নিলেন কবি তার প্রাণের সব রঙ, সব মাধুর্য। এমন কোরে আঁচল সরিয়ে, অবগুণ্ঠন খুলে প্রকৃতি আর কাউকে কখনো জানিয়ে দেয় নি আপনার রূপ-রস-গন্ধ।

প্রকৃতির সব রহস্য জেনে নেবার আনন্দে ভরপূর হোয়ে কতো ছবি, কতো বিচিত্র ছবি, বিশেষ কোরে বর্ষার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান। আকাশ ঘিরে মেঘ, ঝাপসা গাছ-পালা। আকাশে সন্ধ্যের ছায়া, মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজলো ঠং ঠং। এই ঠং ঠংও মনের ছবির অঙ্গ। সেই বৃষ্টি নিয়ে গেলো স্মৃতির মঞ্জুষা খুলে বাল্যের দিনগুলিতে।

তারপরে বৃষ্টির ধারা বেয়ে পৌঁছলুম গিয়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর দেশে, কঙ্কাবতীর ঘাটে, শিবঠাকুরের দরজায়। একেবারে রূপকথার রাজ্য। বাস্তবের পার থেকে ওপারে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দেবার খেয়া হোলো বৃষ্টি।

ছবি গেলো বদলে। নীল অরণ্য শিহরিছে বজ্রের গর্জনে। ভিজে মাটির গন্ধে উন্মনা নব-যৌবনা বরষা আস্‌ছে। আজ মেঘের কাজল-পরা দিন, প্রহরগুলি আবেশে মন্থর, কোথায় আছো তোমরা? আজ নীপশাখে ঝুলনা বাঁধো। অধরে অধরে অলকে অলকে মিলনের দিন আজ।

আমাদের ডাক দিয়ে কবি বোল্‌লেন—দেখো বাদলের নীলনবঘনের ধারা ঝরঝর ঝর্‌ছে, আউসের ক্ষেত জলে ভরভর, ওপার কালিমাখা মেঘে আঁধার। ঘাটের পথ পিচ্ছল, বেণু বন ঘন ঘন দুল্‌ছে।

শুধু এই ছবিগুলি এঁকেই কবি কিন্তু থেমে যান নি। যতোই সুন্দর হোক্ না কেন এই ছবি, এ ছবি দেখার পরেও মন বলে—বাকী থেকে গেলো, মেঘ মনের আকাশে এলো না। পূবে হাওয়া বুকের মধ্যে বইলো না বর্ষা নাম্‌লো না হৃদয়ের শুষ্ক মরুভূমিতে।

বৃষ্টি তাই শুধু মেঘের বৃষ্টি রইলো না, বৃষ্টি হোলো আকাশের মনের কথা। 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে।' নেমে এলো সেই মনের কথা আমার বুকের মধ্যে। আজ বর্ষা উছল। কালো ঘন কেশের মতো ঘন কালো মেঘ নেমেছে তীরে কিন্তু এই তীর তো আমার হৃদয়-নদীর তীর। 'আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম, মেঘ নামিয়াছে মোর দুইটি তীরে।'

ঘন ঘোর বরিষা, তপনহীন তমসা, সব ব্যর্থ হবে যদি তাকে কিছু না বলা যায় এমন দিনে।

'এমনদিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়,
এমন মেঘ-স্বরে বাদল ঝরঝরে তপনহীন ঘন তমসায়।'

এই ঘন ঘোর মেঘ, রৌদ্রহারা দিন, ঝরঝর বাদল সব ভিতরে বাইরে ছুটোছুটি কোরছে। আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝর্‌ছে। শুধু কি মাঠ বন সিক্ত হোলো সেই বৃষ্টিতে? শুধু কি নদীই ভ'রে উঠলো কূলে কূলে? না, তা নয়।

মন সিক্ত হোয়েছে, 'হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল।'

আজ বৃষ্টি-ধারা নেমেছে, তা'তে কি শুধু ময়ূরময়ূরীই নাচছে উপবনে? আমার হৃদয় নাচছে—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের হতো নাচে রে।' শুধু কি আকাশেই মেঘের নীল অঞ্জন? তাই যদি হোতো তা হোলে এমন কি বেশী হোতো! আমার নয়নে লেগেছে নীলিমার নীল অঞ্জন। তৃণদলে বনছায়ে শুধু কি বৃষ্টির হরষ নেমে এসেছে? আমার প্রাণের হরষ বিছিয়ে দিয়েছি আমি বনছায়ে, তৃণদলে। আজ যে শুধু আকাশ মেঘে আকুল তা' নয়, আজ হৃদয়ও আকুল। আজ বুকের মধ্যে পূবে হাওয়া, বুক-জোড়া মেঘ। এই আকুলতায় হৃদয় আনমনা। বাইরের দেনাপাওনার হিসেব সে ভুলে বসেছে একেবারে। তাই—'ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।' আজ হৃদয়-নদীর কূলে কূলে লহরী জেগেছে। ব্যথা বাধা মানছে না,

মান্‌ছে না কূল। শুধু কি আকাশেই সজল-ঘন নবীন মেঘের বর্ষণ, আজ হৃদয়-গগনে সজল-ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষিছে। অ-পরশ আঁচলের নব নীলিমা ছেয়ে দিলো বুক গোপন পরশে। মন মেঘের সংগী, উড়ছে মন হংস-বলাকার পাখায়। আজ কোন নির্দিষ্ট সংকেত স্থলে যাবে না মন অভিসারে। আজ 'পথ ভুলিবার খেলা, মন হারাবার বেলা'। আজ দূর হ'তে দূরে অজানা হ'তে অজানায় মনের অভিসার।

তিমির-নিবিড় রাতে যখন বৃষ্টি নাম্‌লো তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে। আকাশে তখন মত্ত প্রলাপে শ্রাবণ-ধারার প্লাবন চলেছে। আমার নিভৃত স্বপ্ন বাহির হোয়ে এলো বুক থেকে, দেহের সীমা গেলো সে পারায়ে। মন মিলে গেলো মত্ত হাওয়া ছন্দের সঙ্গে।

বাইরে আর বাইরে থাকলো না, বাহির ভিতর এক হোয়ে গেলো। দেহের অভিসারের পথে ঘুরে ঘুরে মন ক্লান্ত হোলো না। অসীম অন্তহীন অন্তর-আকাশে পাড়ি দিলো মানস-যাত্রী মন।

দেহ যার অন্ত ; সে রস, সে কবিতা ব্যর্থ। দেহ ও মনকে যে মিলিয়ে দিলো, বাঁধলো এক সুরে, দেহকে মন কোরে দিলো, হারিয়ে গেলো সীমা মন ও দেহের মধ্যে যে অনুভূতির পরশে— সে অনুভূতি ধন্য, সে কবিতা ধন্য। মাংসল কবিতা মাংসকে লোলুপ করে, মনকে স্পর্শ করবার সাধ্য তার নেই। সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা দেখবার ও দেখাবার সাধ্য তা'র নেই।

রবীন্দ্রনাথ সেই 'অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমার' কবি। তাঁর

বর্ষার গানে ও কবিতায় ধরণীর সঙ্গে গগনের, প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের মিলন-ছন্দ আমরা শুনি। ব্যক্তির বেদনা, বিরহ, অনির্বচনীয় অনুভূতি, তার মনের ঢেউ, প্রবাহ, চঞ্চলতা, নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে তা'র হৃদয়ের ব্যাকুলতা, সব শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নানা গানে, নানা কবিতায় আর বিশেষ কোরে তাঁর বর্ষার গানে আর কবিতায়। ব্যক্তির অন্তর-ব্যকুলতার ধ্বনি অনুপম গভীরতার সঙ্গে শুনিয়ে তিনি কিন্তু থেমে যান নি। সমস্ত মানব জাতির বরষার রূপও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। শোনালেন তিনি বিশ্ব-মানবের বর্ষার রূপ ঃ

'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে,
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে,
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।"

আজ মানবের হৃদয়ে ভীমা নৃত্য কোরছে, সে চলেছে ধেয়ে সীমা লোপ কোরতে কোরতে। আজ বক্ষে বক্ষে সংঘাতে বজ্রের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চলেছে দলে দলে সুদূরের পানে, তাদের এই চলার শেষে যে ভীষণ জীবন-মরণ অপেক্ষায়মান তা' তারা জানে না। শোনো ঝড়ের বাণী। দিগন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে ভবিতব্যতা তা'র ভাষাহীন ব্যথা মানব-হৃদয়ের অন্ধকারে বাজছে, সামনে যে আসন্ন কাজ তা'র কালো কল্পনা ঘনিয়ে উঠেছে দিগন্তে। যে মহাবরিষণ আসছে,

মহাকাল-হাতে যার দুন্দভি বাজছে, বিশ্বের আকাশে-বাতাসে যার ইঙ্গিত, সেই যুগান্তিকা বর্ষা ফেলেছে তা'র ছায়া কবির হৃদয়ে। বিশ্ব-মানবের এই বর্ষা-রূপ, এই ভীষণ-সুন্দর রূপ উপলব্ধি কোরেছেন রবীন্দ্রনাথ ; আর একমাত্র তিনিই মানুষের এই সীমা-লোপ-করা নবজীবনের যাত্রাকে বর্ষার রূপে এঁকেছেন।

প্রকৃতি, ব্যক্তি ও বিশ্ব-মানব এই তিনটি ধারা এসে মিশেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের মোহনায়। পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে আর কোন কবি বর্ষাকে এমন অপরূপ রূপে, এমন হৃদয়-হরণ রূপে মানুষের চিত্ত-লোকে অবতীর্ণ করাতে পারেন নি।

আষাঢ়ের পূর্ণিমা আজ। বর্ষা নেমেছে। আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। মেঘের ছায়া-মাখা দীঘির জল যেন তরল কালো মেঘ। জোনাকির বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে দিঘির কালো জলের মেঘে। মনও আজ দীঘির জলের মতোই কালো আকুলতায়। কেয়া কদম্বে রেষারেষি লেগে গেছে বনে উপবনে।

আজ বাইরের বর্ষাকে অন্তরের মধ্যে টেনে নিতে হবে। প্রকৃতির বর্ষা আমাদের অন্তরে আনুক বর্ষণ। আজকের এই বর্ষণ-উৎসবের গান, আবৃত্তি ও নৃত্য অন্তরে রস সঞ্চার করুক, হৃদয়ের শুষ্কতা দূর হোক্, অবসান হোক্ প্রাণের তৃষ্ণার, শ্যামল হোক্ আমাদের অন্তর।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত

প্রকৃতির সংগে মানুষের প্রথম পরিচয় বড়ো নিষ্ঠুর পরিচয়। প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে মানুষের সে দিন কোনোই ধারণা ছিলো না। প্রকৃতি তখন ভয়ঙ্করী রূপে মানুষের চোখে প্রতীয়মান। সূর্যের রোষাগ্নিতে ক্ষেত দগ্ধ, ক্লান্ত পৃথিবী মূর্ছাতুরা। শীতের হিমের তরোয়াল শরীরকে টুক্‌রো করে কাটছে। প্রকৃতি তখন মৃত্যুস্বরূপিনী, বিনাশের দূতী রূপে মানুষের কাছে দেখা দিয়েছে। তাই নতুন জীবনের ও শ্যামলতার বাঁতাবাহী বর্ষা আর বসন্ত—প্রকৃতির এই দুটি ঋতু-রূপ প্রাচীন কাল থেকে মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। এই কারণেই লোক-সংগীতের উৎপত্তি হচ্ছে ঋতুর পরিবর্তনে। তবে সব ঋতু নয়, শুধু বর্ষা আর বসন্ত। এই দুটি প্রাণের রস রূপ নিয়েছে লোক-সংগীতে।

পরবর্তী কালে যখন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হোলো সে সৃষ্টিও ঋতু-বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে হোলো। রাগরাগিণীর সৃষ্টির যে ইতিহাস পুরাণ থেকে আমরা পাই তা থেকে দেখা যায় যে, মহাদেব আর পার্বতী ছয় রাগ সৃষ্টি করেন। ছয়টি ঋতুর দিকে লক্ষ্য রেখেই মনে হচ্ছে ছয় রাগের সৃষ্টি। ব্রহ্মা এই ছয় রাগ শিখে নেন আর ছয়টি ঋতুর প্রত্যেকটির জন্যে এক একটি রাগ নির্দেশ করে দেন, যেমন বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, হেমন্তে শ্রী, শরতে ভৈরব, শিশিরে নটনারায়ণ পরে মন তৃপ্ত রইলো না এই ছয়টি রাগে; অভাব বোধ হতে লাগলো।

তখন ব্রহ্মা ছয়টি রাগের জন্য ছয়টি করে রাগিণী-ভার্যা সৃষ্টি করলেন। যেমন বসন্ত রাগের ছয়টি ভার্যা হলেন—দেশী, দৈবগিরি, বৈরাটী, টোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলী—যাকে আমার দেশ, দেওগিরি, বারাড়ী টোড়ি, ললিত ও হিণ্ডোল বলি। বর্ষা ঋতুর মেঘ রাগের রাগিণী-ভার্যারা হলেন—মল্লারী, সৌরটী, সায়েরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গার। যাদের মল্লার, সুরট, কৌশিক গান্ধার ইত্যাদি বলা হয়। রাগিণীর নামগুলির উপর এই নির্মম অত্যাচার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জনসাধারণের দৌরাত্ম্য সে কালেও ছিলো।

এই রাগিণী-ভার্যাগুলি সেই প্রাচীন কালের লোক, আধুনিকা তাঁরা একেবারেই নন। তাই স্বামীদের অনুগামিনী এঁরা। মুখ হয়তো বাঁকান ললিত ছন্দে কিন্তু স্বামীর মনে দুঃখ দিয়ে বাঁকা পথে চলেন না। তাই স্বামী যদি হন বসন্ত-প্রাণ, যেমন বসন্ত রাগ, তাহলে বসন্ত রাগের ছয়টি ভার্যা বর্ষাঋতুর মেঘ রাগের অনুগামিনী হয়ে বৃষ্টি নামাবেন না নিশ্চয়ই। যে রাগ যে ঋতুর, সেই রাগের রাগিণী-ভার্যাগুলি শুধু সেই ঋতুতেই গেয়।

কালে এতেও মন ভরলো না। তখন মহর্ষি ভরত প্রত্যেক রাগের আটটি করে পুত্র নির্দিষ্ট করে আটচল্লিশটি উপরাগ সৃষ্টি করলেন। দিন ও রাত আট প্রহরে বিভক্ত। তাই এক একটি রাগের আটটি করে পুত্র নির্দিষ্ট করেন মহর্ষি ভরত। সময়ের উপর নজর দেওয়া হোলো এই প্রথম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও যে রাগের পুত্র এরা, সেই রাগ যে ঋতুতে গেয় সেই ঋতুতেই একটি রাগের উপরাগ-পুত্রেরা গেয়। অন্য কোনো ঋতুতে গাওয়া

শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সংগীতের প্রধান চারটি মত —ব্রহ্মার মত, হনুমন্ত মত, ভরত মত ও কল্লিনাথ মত। কোন রাগ কোন ঋতুতে গাওয়া হবে তা নিয়ে এঁদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কিন্তু ঋতু অনুযায়ী যে রাগরাগিণীর ব্যবহার, তা এঁরা প্রত্যেকে স্বীকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থকর্তা সোমেশ্বর তাঁর 'রাগ-বিরোধ' গ্রন্থে যে মত ব্যক্ত করেছেন সেই মত অনুসারে বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে ভৈরব, বর্ষায় মেঘ, শরতে পঞ্চম, হেমন্তে নট-নারায়ণ ও শিশিরে শ্রী রাগ গেয়। তাঁর মতে ঋতু-অনুসারে রাগরাগিণীর সৃষ্টি। সময় বিচারের প্রয়োজন নেই।

তাই শুধু লোক-সংগীত নয়, রাগরাগিণীও ঋতুর উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। কালে রাগরাগিণীর এই ঋতুগত উৎপত্তির কথা লোকে ভুলে গেলো, রয়ে গেল শুধু প্রহরের ভিত্তিতে রাগরাগিণীর সৃষ্টি—এই কিছুটা ঠিক কিছুটা ভুল ধারণা। এমনি করে রাগ-রাগিণীর সীমার মধ্যে ঋতুগুলিকে আর ঋতুর বন্ধনে রাগরাগিণীগুলিকে সীমিত করেছেন প্রাচীন সুরকারেরা। রবীন্দ্রনাথ এই সীমা স্বীকার করেন নি।

গ্রীষ্মের বর্ণনায় ভৈরব ও নটরাগ শাস্ত্রকারের নির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের গানে বর্ষার মেঘ-রাগ-বধূ মূলতানী, হেমন্তের নট-কেদার, সারং, হাম্বির, গৌর-সারং ব্যবহার করেছেন। ভীমপলশ্রী, ভৈরবী ও কানাড়া মিশিয়ে গ্রীষ্মের গান রচনা করেছেন।

বৈশাখ সে রুদ্র সন্ন্যাসী, তার তপস্যার অনলে দিগ-দিগন্ত জ্বলছে ধূধূ করে। ভীষণ সে উগ্রতপা সন্নাসী, নির্মম

সে। তপঃক্ষীণা গৌরীর মতো ধরণী আজ ক্লান্তা, পাণ্ডুরা। গ্রীষ্মের এই রূপ বর্ণনায় লাগলো হেমন্তের নট আর শীত ঋতুর কেদারা-মিশনো নটকেদার।

মধ্য দিনে বৈশাখের অগ্নি-শিখার দহনে দিগদিগন্ত প্রজ্জলিত। মূর্চ্ছাতুর বনানীতে পাখীর গান স্তব্ধ। সেই রৌদ্র-দগ্ধ নিঃস্তব্ধ ক্ষণে হে রাখাল বাজাও তোমার বেণু। আকাশের প্রান্তে মেঘের গম্ভীর ডম্বরু বাজছে, বিদ্যুতছন্দে আস্‌ছে কাল-বৈশাখী। এমন একটি অগ্নি-জ্বালা মধ্য দিন বাঁধা পড়লো হেমন্তের হাম্বির রাগে—'মধ্য দিনে যবে গান'। রৌদ্র-দগ্ধ দিন, বিনিদ্র রজনী। অগ্নি-বাণ-বিদ্ধ অন্তরে দারুণ তৃষা। শুষ্ক শাখে ক্লান্ত কপোতের ডাক। এমন একটি দুপুরের ছবি ফুটে উঠ্‌লো হেমন্তের সারংএর সুরে—'দারুণ অগ্নি-বাণে'।

ঝরাপাতা, ঝরে-পড়া ফুল, জনহীন পথে রৌদ্র-মরীচিকার জাল পাতা। আকাশভরা তৃষা, শুকিয়ে গেছে প্রাণ—এমন এক দুপুরের বিষাদ-মাখা ছবি আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ষার মুলতানী, বেদনার আমেজ-ভরা ভৈরবী আর ভীমপলশ্রী মিশিয়ে —'প্রখর তপন তাপে'

রূপের বৈচিত্র্য অনুভূতির বৈচিত্র্য এগুলি দুএকটি সুর দিয়ে প্রকাশ করা যাবে কেন? সুরের বৈচিত্র্য ছাড়া এই প্রকাশ কি কখনো সম্ভব হতে পারে? দরবারী সংগীতের এই অপূর্ণতা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গানে অনুভূতির অসংখ্য পাখী সীমাহীন সুরের দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশে ডানা মেলেছে। এবারে শোনা যাক তাদের কাকলী।

আজ আকাশ-ভরা তৃষা, বায়ুর বুকে হাহাকার, দীর্ঘ পথের

শেষে এসে ডাকছি—দ্বার খোল। কবে একদিন বাহির হয়েছিলেম কার ডাকে, জানিনে। আজতো তার সাড়া পাই না। আজ সারা দিন প্রাণে সুর ভরে উঠেছে, কেমন করে বইবো গানের ভার!

এতদিন জলে স্থলে আকাশে চলছিলো আগুনের হোলিখেলা। পাণ্ডুরা পৃথিবী, ধূসর গাছপালা। —মূর্ছাতুর আকাশের দীর্ঘশ্বাসের মতো বইছিলো উত্তপ্ত বাতাস। তৃষার্ত ধরণীর প্রাণের বেদনার মতো ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া। সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে সূর্যমুখী। এবারে এলো আষাঢ়। লাল, হল্‌দে, ধূসরের পালা সারা হোলো। কালো মেঘের অবগুণ্ঠন-ঘেরা আকাশ। মেঘাবগুণ্ঠন সরিয়ে দেখা দেয় বিদ্যুতের চকিত চাহনি। এবারে রঙের এক নতুন নক্‌সা। আকাশের কালো, মাঠের সবুজ আর বর্ষার ফুল কদমের হলুদ বরণ। ভিজে মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কেয়ার গন্ধ। রস-বিহ্বলতা ধরণীর চোখে মুখে।

প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে বর্ষা ঋতুতে গাওয়া হবে মেঘ রাগ। মেঘ রাগের ভার্যারা—মল্লারী, গান্ধারী প্রভৃতি তাঁরা অবিশ্যি বাদ পড়বেন না, মেঘের ছেলেরা যথা শঙ্করাভরণ, জয়ৎ প্রভৃতি, এঁরাও বর্ষা ঋতুতে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘরাগ জাতীয় এই ক'টি রাগরাগিণী ধার্য করা আছে সংগীত-শাস্ত্রে বর্ষা ঋতুর গানের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ এই বন্ধন মানেন নি। বর্ষার গানে তিনি শুধু মল্লারই ব্যবহার করেন নি। সাহানা, ইমন, পিলু, সিন্ধু, হাম্বির, দেশ, পঞ্চম প্রভৃতি বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত ঋতুগুলির নানান রাগরাগিণী তিনি ব্যবহার করেছেন।

হেমন্তের ইমন ফুটিয়েছেন আষাঢ়ের নীল নব ঘনরূপ—'নীল নব ঘনে।'

শ্রাবণের রাত, সংগীহারা, অন্ধকার রাত। একা, নিদ্রাহীন শ্রবণে বাজে শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা। এই ছবিটি কি মল্লার রাগিণীর সুরের রেখা দিয়ে আঁকতেই হবে? বাহারকে বসন্তের রাগ বলে চিহ্নিত করে দিলেই কি সে শুধু বসন্ত ঋতুর ক্রীতদাস হয়ে যুগযুগান্ত কাটাবে বন্দীশালায়, বসন্তের কারাগারে? রবীন্দ্রনাথ বাহারকে মুক্তি দিয়েছেন বসন্তের বন্ধন থেকে। বাইরের ও অন্তরের যে কোনো রূপ ফোটাবার স্বাধীনতা দিলেন তাকে। তাই বাহার এসে মিশলো মল্লারের সঙ্গে 'সঘন গহন রাত্রি' গানটিতে।

বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণের একটি রাতকে চিরন্তন করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ সোহিনী, বসন্ত ও পঞ্চম রাগ মিশিয়ে 'আজি বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণ-রাতি' গানটিতে। বিরহ আছে, কিন্তু এ বিরহের অন্তরে আছে আশা, আছে মিলনের প্রত্যাশা, আনন্দ। সাথী আসছে নীপবনে পুলক জাগায়ে। তাই শ্রাবণ-রাত্রির এই বিশেষ অনুভূতিকে ধরে রাখলেন কবি সোহিনী, বসন্ত ও পঞ্চমে।

অন্তরের বেদনা জানে সুদূরের যে মিতা তার জন্যে বর্ষণ-ঘন দিনে প্রাণের আকুলতা প্রকাশ করলো আপনাকে কীর্তনের সুরে—'আমার কি বেদনা সে কী জানো' গানটিতে।

বর্ষণ থেমে গেছে। এসেছে শরৎ। আকাশে কালো মেঘের ঘটা আর নেই। নীল আর শাদা এই দুই রঙের বুননি আজ শরতের মেঘে। মেঘের অলস গতির খেলা আকাশে। সবুজ থেকে সোনালী হয়েছে ধরণীর আঁচল পাকা ধানের সোনার

রঙে। এবারে নীল আর সোনা—দুই রঙের খেলা আকাশ-পৃথিবীতে।

শাস্ত্রকারদের মতে শরতের রাগ হচ্ছে ভৈরব। রামকেলী, গুর্জরী, সৈন্ধবী, মধুমাধবী—এঁরা সব হচ্ছেন শরতের রাগিণী।

শরতের রূপ, শরৎপ্রাতের মনের মধ্যে মন-কেমন-করা আলোর খেলা ফুটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যোগিয়া, বিভাস, বাউল, বিলাওল, দেশ, কামোদ, কেদারা, ভৈরবী, গৌরসারং প্রভৃতি বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সুরে।

শরতের ফুল শিউলি। কেয়া, কদম্ব যেমন বর্ষার রূপের প্রতীক, শিউলি তেমনি শরতের। শিউলির রূপে গন্ধে আত্মহারা কতো কবি শেফালির রূপ-বর্ণনা করেছেন। মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহার কাব্যে শিউলির রূপ-বর্ণনা করে বলছেন—'শিউলি ফুলের রঙে আলো-করা বনতলে পাখীর গান ধ্বনিত হচ্ছে। বনের প্রান্তে শোভা পাচ্ছে হরিণীর চপল কালো আঁখি। মন আজ উতলা হয়েছে।' কিন্তু শিউলি বনের মনের কামনার রূপ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কবির চোখে কখনো ধরা পড়ে নি। শিউলি বনের মনের সেই কামনা টোড়ী ভৈরবিরত ধরে দিয়েছেন মহাকবি আমাদের হৃদয়ের সামনে—'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা'-য়।

শরতের নীল আকাশ, সোনালি মাঠ, রূপালি ক্ষণিক ধারার খেয়ালী খেলা। কতো ভাবের কতো রঙে হৃদয় ভরপূর। তার একটি ভাব, একটি আবেগ ধরা পড়লো গৌর সারংএর সুরে গাঁথা 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' গানটিতে।

এলো হেমন্ত। পাতা ঝরার কাল। শূন্যে ঝরা পাতার

আল্পনা দেয় বাতাস। বনতলে বাতাসের অলখ চরণের চপল পরশে বাজে ঝরা পাতার গান। আভরণহীনা হেমন্তের প্রকৃতি। নতুন সৃষ্টির জন্যে প্রকৃতির অন্তরের রঙশালায় তৈরী হচ্ছে নতুন রঙ। প্রান্তরে পাকাধানের সোনা ছড়ানো। সায়র পদ্মবিলীন, তুষার পড়ছে। বাতাসে শিশিরের সজল পরশ। কোয়েল-ডাকা বন আজ স্তব্ধ। হিমের আঁচল দিয়ে তারার প্রদীপ আজ ঘিরে নিয়েছে হেমন্তলক্ষ্মী। আকাশ-প্রদীপ আজ তারার প্রদীপের জায়গা নিয়েছে। বাইরের এই রিক্ততার অন্তরে আছে কিন্তু আগামী দিনের পূর্ণতা। হেমন্তে তাই বসন্তের বাণী পৌঁছে দেয় পূর্ণিমার চাঁদ। শাস্ত্রমতে হেমন্তের রাগ হচ্ছে মালকোষ আর হেমন্তের রাগিণীরা হচ্ছেন টোড়িকা, খাম্বাবতী, গৌরী ও হিন্দোলা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গ্রীষ্মের রাগিণী খাম্বাজে রচনা করলেন—'হেমন্ত কোন বসন্তের বাণী'।

শীতের বেলা, ঝিকিমিকি আলোর খেলা আমলকী বনে। বনের নগ্ন ডাল ধরে নাড়া দিয়ে উত্তরে হাওয়া হাসছে হাহা করে। ক্ষণ-আয়ু দিনের সাথী সূর্য কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। শিউলি পলাতকা।

শীতের রাগ যদিও শ্রী আর রাগিণীরা মালশ্রী, আশাবরী, পাহাড়ী, ত্রিবণী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ শীতের রূপ আঁকলেন নটরাগে 'শীতের হাওয়ায় লাগ্‌লো নাচন' গানে, আর পূরবী আর শ্রী মিশিয়ে রচলেন 'এলো যে শীতের বেলা' গানটি।

বসন্তের কি শুধু একটিই রূপ আছে; শুধুই সবুজ পাতা, শুধুই ফুল, শুধুই দখিন বাতাস? তার একটি সকালের সঙ্গে অন্য সকালের, একটি দুপুরের সঙ্গে অন্য একটি দুপুরের, একটি

স্বপ্নময়ী নিশিথিনীর সঙ্গে অন্য একটি মাধবী রাত্রির কি কোনই পার্থক্য নেই ?

একটি বসন্তের দুপুর, সে যেন রূপকথার তেপান্তর মাঠ, অফুরন্ত রহস্যে ভরা। আর একটি দুপুর সে যেন বিষাদের মরীচিকা-ভরা মরু। একটি বসন্তের সকালে বুকে দু-কুল-ছাপানো আনন্দ, আর একটি সকালের বেদনার ফুলে নুয়ে-পড়া প্রাণের লতা। একটি রাত্রি মিলনের রক্তিম রঙে রাঙা, আর একটি রাত্রি বিরহ-বেদনার প্রশান্তিতে ঘেরা।

এইসব রঙ বাইরের ও অন্তরের বসন্তের, সবই কি ধরা পড়বে বাঁধাধরা ক'টি সুরে ? শুধু গানের কথাগুলি হবে আলাদা, সুর এক থেকে যাবে ? এ দৈন্য কি কখনো স্বীকার করা যায় ? রবীন্দ্রনাথ এই দৈন্যের বাঁধন অস্বীকার করেছেন। শাস্ত্রকারদের মতে বসন্তের রাগরাগিণী হোলো পঞ্চম, বসন্ত, হিন্দোল, ভূপালী, পটমঞ্জরী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার মল্লার, হেমন্ত কিম্বা শীতের হাম্বীর প্রভৃতি নানা ঋতুর রাগরাগিণীতে বসন্তের গান রচনা করেছেন। যেমন 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' গানটি হাম্বীরে বেঁধেছেন। 'বসন্ত তার গান লিখে যায়' গানটিতে বসন্তকে এঁকেছেন বর্ষার মল্লার দিয়ে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।

মেঘমল্লারের সুরে বসন্তের একটি বিশেষ রূপকে বাঁধা হোল 'মম অন্তর উদাসে' এই গানটিতে।

শরৎ ঋতুর রাগিনী কালাংড়ার সঙ্গে পরজ মিশিয়ে সৃষ্টি হোলো 'ফাল্গুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগলাঝোরা লুকিয়ে ঝরে' গানটি।

ত্রিবেণীতে যেমন গঙ্গা যমুনা দুটি ভিন্ন ধারায় রেখা স্পষ্ট, 'পুরাতনকে বিদায় দিলে' এই গানটিতে তেমনি বেহাগ ও খাম্বাজের মিলন ও পার্থক্য সুস্পষ্ট। রাগিনী দুটিকে মেশানো হয়নি, একই গানে দুটিকে পৃথক রেখে ব্যবহার করা হয়েছে। গোড়ায় বেহাগ, সঞ্চারীতে খাম্বাজ, শেষের দিকে আবার বেহাগ।

দরবারা সংগীতে শুধু দুটি ঋতু নিয়ে কারবার—বর্ষা আর বসন্ত। অন্য ঋতুগুলি উপেক্ষিতা হয়েছে। ছ'টি ঋতুর ডালি ভরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গানের ফুলে। এমন করে প্রকৃতির বুকের আঁচল সরিয়ে তার বিচিত্র ও অন্তহীন রূপরসগন্ধ আর কোনো কবি কখনো দেখেন নি। তিনি যে শুধু প্রকৃতির বাইরের রূপ দেখেছেন তা নয়, তিনি তার প্রাণের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা, তার রূপ-তরঙ্গিমা দেখেছেন!

শাস্ত্রকারদের নির্দেশ তিনি নির্বিচারে উপেক্ষা করেন নি। তাঁদের নির্দেশের মর্ম তিনি গ্রহণ করেছেন। নির্দেশ যেখানে গতির ব্যঞ্জনা, সেই নির্দেশ তিনি মেনেছেন। কিন্তু নির্দেশ যেখানে নিষেধ, গতির সমাধি-রচনা সেখানে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী, ব্রাত্য। শুধু সুর দিয়ে ঋতুর রূপ ফোটাতে চেয়েছেন প্রাচীন সুরকার। কথা ও সুর দিয়ে ঋতুর রূপ ফোটাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েকটি বিশেষ রাগরাগিনীর বন্ধনে ঋতুগুলিকে বন্দী করেছিলেন প্রচীন সুরকারেরা। রূপের অসীম প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছেন সুরের অনন্ত ব্যপ্তিতে।

